মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্ট্যালিন হো চি মিন ও মাও সেতুঙের কবিতা

মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন হো চি মিন ও মাও সেতুঙের কবিতা

সম্পাদনা ও ভূমিকা

সন্দীপ সেনগুপ্ত

মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিন হো চি মিন ও মাও সেতুঙের কবিতা

প্রকাশক
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, মুক্তিভবন নিচতলা
(কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়) পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
সেল: ০১৭২৬-১২৩৫৫০
www.biplobiderkotha.com, rafiqcpb@gmail.com

বিপ্লবীদের কথা প্রথম সংস্করণ
অক্টোবর ২০১৪

প্রচ্ছদ
মেহেদী বানু মিতা

বর্ণ বিন্যাস
মিফতাহুর রহমান চৌধুরী

বানান শুদ্ধিকরণ
জান্নাতুল ফেরদৌস লাবণি

মুদ্রণ
চিত্রকল্প
১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরেরপুল, ঢাকা – ১০০০

ISBN: 978-984-90789-6-8

মূল্য: একশত ত্রিশ টাকা

পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, মুক্তিভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

উৎসর্গ

জার্মানি রাশিয়া ভিয়েৎনাম চীন ও ভারতবর্ষের জনগণের উদ্দেশ্যে

সংস্করণ প্রসঙ্গে

মানুষ মানুষকে শোষণ করবে, নিপীড়ন করবে, নির্যাতন করবে, তা কি করে হয়? শুধু শোষণ-বৈষম্য ও নির্যাতনই নয়, ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-জাতপাতের প্রশ্নই মুখ্য– সব মানুষ এক নয়, তা কি করে হয়? মানবসভ্যতার উষালগ্ন থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত যা অব্যাহত ছিল। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশহেতারে ঘোষণা করলেন সেই অব্যাহত গতিকে রোধ করার মন্ত্র– শুধু ব্যাখ্যা নয়, প্রয়োজন পৃথিবীকে বদলানোর– শোষণ-বৈষম্যহীন মানবসমাজ নিমার্ণের দার্শনিক সূত্র।

পরবর্তীতে মহামতি লেনিন বাস্তবায়ন করলেন সেই দার্শনিক সূত্র। তারপর একের পর এক হো চি মিন, মাও সেতুঙ, চে, ফিদেল, কিং জম ইল সহ আরও অনেকে অব্যাহত রাখলেন একই সূত্রের পাঠ বাস্তবায়ন। শোষণ-বৈষম্যের মানবসভ্যতা সত্যিকারের মানবসভ্যতায় নির্মিত হওয়ার লক্ষ্যে এই দার্শনিকদের অবদান অনস্বীকার্য।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-হো চি মিন ও মাও সেতুঙের দার্শনিক পরিচয়ের বাইরেও তাঁদের অনেক ক্ষেত্রে অবদান আছে। তার মধ্যে কাব্য সাহিত্যেও তাঁদের পদচারণা রয়েছে। এঁদের কবিতা বহু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-হো চি মিন ও মাও সেতুঙের কবিতা সন্দীপ সেনগুপ্ত সম্পাদনা করে একটি সংকলন প্রকাশ করেন (১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কোলকাতা-১২)।

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-হো চি মিন ও মাও সেতুঙের কবিতা সংকলনটির গুরুত্ব বিবেচনা করে কাব্যপ্রিয় পাঠকমহলের কাছে তুলে ধরার জন্য 'বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা' প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করছে।

শেখ রফিক
অক্টোবর ২০১৪
ইকুরিয়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সূচি

ভূমিকা

১.

ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে বিগত শতাব্দীর ধ্যানধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে এই যুক্তি ও এই বোধ প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য তার পারিপার্শ্বিক ও সমষ্টিগত ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল। নেপোলিয়নিক বাদ-বিসংবাদের মধ্যে সমস্ত ইয়োরোপীয় ভূমণ্ডল যেন একটি অগ্নিগর্ভ বিসুভিয়াস, সার্বিক পরিবর্তন বিদ্রোহ এবং বিস্ফোরণের পথ-অন্বেষণে অস্থির। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি একদিকে শাসকশ্রেণির পরিবর্তন ঘটাতে চাইছে, অন্যদিকে সামরিক সৈন্যবাহিনীর অনুপ্রবেশ ও হঠাৎ আক্রমণের বন্যা।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভলমি'র (Volmy) সৈন্যসমাবেশের অব্যবহিত পরে গ্যেটে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন– পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূচনা দেখা দিয়েছে। এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে যখন গ্যেটে ভাইমার (Weimar) যুদ্ধের হৈ হল্লা ও সমূহ বিপদের ভয়ে টেপলিজ (Teplitz) এ পালিয়ে যান– তিনি এই সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন যে সমস্ত আকাশ জুড়ে এক নতুন যুগের পূর্বাভাস এবং একমাত্র রাজনীতিই হবে ঐ যুগের সর্বভুক চালিকা শক্তি। এমন কি প্রাচীন ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দুতে পর্যন্ত এই ভাবনা উদ্বেল হয়ে ওঠে। স্থিতিস্থাপকতা ও শান্তি পুনরুদ্ধারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মেটারনিক (Metternich) ও বৃহৎ শক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে বন্দুক বেয়নেট ও তদন্তকমিশন সামনে রেখে রাজনীতি বহির্ভূত শান্ত ইউরোপ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। কিন্তু সমস্ত ইউরোপের অন্তর্লোকে প্রবাহিত বিদ্রোহের দাবদাহকে তাঁরা নির্বাপিত করতে সক্ষম হননি। জনজীবন থেকে অনিবার্য রাজনীতিকে মুছে ফেলার সমস্ত প্রচেষ্টা বরং বিপরীতভাবে ক্রিয়া করল। যে সমস্ত পরিবারবর্গ ও জনগোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সদাতৎপর ছিল তারা ক্রমশই তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমোন্নতি সাধনের জন্য রাজনীতি নির্ভর হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে জার্মান ভূখণ্ডের বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রগতির সঙ্গে উনিশ শতকি জার রাশিয়ার বুদ্ধিবৃত্তি সমানতালে অগ্রসর হচ্ছিল। যখনই কোন দেশ রাজনৈতিক সমালোচনার কণ্ঠরোধ করে, যখন দেশের রাজনীতিবিদগণ স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা পায়– সর্বস্তরের সমালোচনা এমনকি সাহিত্য সমালোচনাও তখন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলভুক্ত হয়ে ওঠে। এবং এরকম অবস্থায় বিশুদ্ধভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্য, সৌন্দর্যবোধও দর্শন অপ্রতিরোধ্যভাবে ক্ষমতা অধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে Walfgang Menzel এর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Dic deutsche Literature' দারুন উদ্দীপনা ও এক নবতর ভাবনার বাহন রূপে আবির্ভূত হয়। এই গ্রন্থে মেনজেল সর্বাধুনিক রাজনৈতিক বক্তব্য ও চিন্তারাশিকে সাহিত্যভাবনার সূক্ষ্ম অন্তরালে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মেনজেল ছিলেন ওয়াটারলু যুদ্ধের সৈনিক ও 'Burschenschaft' এর সদস্য। পরবর্তীকালে তিনি সাংবাদিকতাকেই জীবিকারূপে গ্রহণ করেন। বৃহৎ বপু এই

গ্রন্থে জার্মান সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ফরমান অনুধাবন করা আদৌ কোন কঠিন কাজ ছিল না। মেনজেল লিখেছেনঃ "স্বচ্ছ ও মুক্ত ভাবনার চেয়ে শব্দকে অধিক মূল্য দেবার মতো ভ্রান্তি অন্য যেকোন ব্যাপারের তুলনায় বেশি সাধারণ, বিশেষ করে ছাপান শব্দ, এবং মানুষের চেয়ে বইকে।...তথাকথিত পুস্তকের মধ্যে মানুষের চেতনা শ্লথ হয়ে পড়ে...মানুষ হৃদয়ের উত্তাপ ও চেতনা দ্বারা শব্দ শেখে এবং নিজস্ব চিন্তারাশিকে অগ্রগতির পথে বহন করে নিয়ে যাবার কষ্ট থেকে বিশ্রাম পায়।...মুক্তচিন্তার অধিকারী মানুষের মধ্য থেকে শাসকশ্রেণিপরিপুষ্ট ও তাদের স্নেহধন্য বই লিখিয়েদের পাঠক তৈরি করা বুদ্ধিহীন ভেড়ার পাল তৈরি করার মতই সহজ কাজ।"

Metternich এর সময় সাহিত্য-ঐতিহাসিকতা যথেষ্ট আস্থা অর্জন করেছিল। যখনই রাজনীতি প্রত্যেকটি লোকের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা হয়ে উঠল, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ধ্যানধারণা প্রতিটি তত্ত্বমূলক আলোচনায় মাথা উঁচিয়ে রইল। Madam de Stael ও Walfgang Menzel এর জার্মান পাঠকবৃন্দ তখন পর্যন্ত চিরাচরিত ধর্মীয় আচরণ দোষে দুষ্ট ছিল এবং এই ঘটনা সমস্ত অবস্থাটাকে আরও বেশি বিষাদগ্রস্ত করে। স্বল্প কয়েকজন মাত্র 'Bur schenschaft' এর কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে বিভিন্ন বৈঠক ও মিটিং এর মাধ্যমে। প্রায় সকলেই জার্মান সীমান্ত থেকে বহু দূরের বিপ্লবী ধ্বনি থেকে আত্মতৃপ্ত থাকতে চাইতো। বীর গ্রীকবৃন্দ ও পোল্যাণ্ডবাসীদের সমবেদনা জানিয়ে শান্তি পেতে চাইতো। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের প্যারিস বিপ্লব এবং পোল্যাণ্ডে তার প্রতিধ্বনি জার্মানীর মূল অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। হাইনে ও বোর্নে জয়লাভের বস্তুবাদী কারণ সন্ধানের জন্য প্যারিস ভ্রমণ করে আসেন। এবং অন্যান্য লেখকবৃন্দ তাদের প্রসাদগুণসম্পন্ন ভ্রান্ত ও চেতনাহীন অতৃপ্ত ও হতাশব্যঞ্জক ধ্যানধারণায় পরিপূর্ণ ঢাউস উপন্যাসাদি রচনা করে জার্মান সাহিত্য ভারাক্রান্ত করে চলেছেন। উত্তর জার্মানির ভাষাবিদ Ludolf Weinbarg 'Young Germany' কে পূর্ব-ত্রিশ দশকের নবদিগন্ত দিশারী উত্তরপুরুষরূপে অভিহিত করেন,– অভিহিত করেন এই কারণে যে ঐ নব্য যুবকবৃন্দ সমাজের সঙ্গে সৃজনশীল মনীষার সম্পৃক্তিকে মূল ভিত্তি করে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

১৮৩৫ খৃস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর জার্মান পার্লিয়ামেন্ট একটি ডিক্রি জারি করে তৎকালীন 'ইয়ং জার্মানী' গোষ্ঠীকে তীব্র সমালোচনা করে। ঐ সমালোচনায় বলা হয় যে এই 'ইয়ং জার্মানী' গোষ্ঠীর আচার আচরণ উচ্ছৃংখল ও তাদের কার্যধারার প্রকৃতি দেশদ্রোহিতার নামান্তর। এখানে স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় 'ইয়ং জার্মানী' গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ ছিলেন জার্মান দেশের তৎকালীন উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ যুবকবৃন্দ। এঁরা ছিলেন সৎ উচ্চাকাংক্ষী। এঁরা সর্বাধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার অগ্রদূত। বোর্নে এবং হাইনে এঁদের আদর্শ। ঐ আদেশনামায় আরও বলা হয়– যদি কোন পুস্তকবিক্রেতা এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত এমন কোন লেখকের পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশনা ও বিক্রির ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তো তার দায়দায়িত্ব সেই পুস্তক ব্যবসায়ীকেই বহন করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে জার্মান পার্লিয়ামেন্ট তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতেও কুণ্ঠিত হবে না।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে Arnold Ruge তার বিখ্যাত পত্রিকা Hallische (Jahrbucher) বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন, বাধ্য হন এই কারণে যে পত্রিকাচালনার ক্ষেত্রে Rugeকে ক্রমশই তরুণ হেগেলীয়ানদের প্রতি নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। এই তরুণদল প্রথাসিদ্ধ বিদগ্ধ তারুণ্যের চিহ্ন প্রুসিয়ার সিভিল সার্ভিসকে অবহেলা করে নতুন সাহিত্য-দার্শনিক আন্দোলনের বন্ধুর পথে অগ্রসর হন। এই সময় Ruge এমন দু'জন তরুণের সংস্পর্শে আসেন যারা তখনও পর্যন্ত তরুণ হেগেলীয়ানদের মানসে কোন রেখাপাত

করেনি। এঁদের একজন হলেন ট্রিয়ের এর অধিবাসী কার্ল হাইনরিখ মার্কস এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন একজন যুবা যিনি নিজের পৌরুষ ও পশ্চাদভূমি– নিজের হাতে নির্মাণ করেছেন, যাকে বলা যায় স্বয়ংসিদ্ধ দার্শনিক, তাঁর নাম ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস।

২.

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে ট্রিয়ের শহরে মার্কস জন্মগ্রহণ করেন। ট্রিয়ের শহর খুবই প্রাচীন এবং ঐতিহ্যময়। শহরের উপকণ্ঠ দিয়ে বয়ে চলেছে মোজেল নদী। নদীর স্নিগ্ধ শোভা শহরের অন্যতম আকর্ষণ এবং সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, অপরূপ নৈসর্গ। মার্কসের বয়স যখন ছ বছর ইহুদিপনার ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন পিতা হার্শেল লেভি। ধর্মান্তরিত পিতা হার্শেল লেভির নবতম খৃষ্টীয় প্রোটেস্ট্যান্ট নামকরণ হলো হাইনরিখ মার্কস। ইতিমধ্যে পিতা হাইনরিখ ও মাতা হেনরিয়েটা আটটি সন্তানের মধ্যে চারটিকে হারিয়েছেন। বেঁচে রইলো কার্ল ও তার তিন বোন। যথা সময়ে পিতার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় কার্লের পাঠক্রম শুরু হয়। পিতা ও পিতৃ-সুহৃদ শহরের বিদগ্ধশ্রেষ্ঠ ভেষ্টাফালেনের প্রভাবে তরুণ কার্ল জার্মান ধ্রুপদী সাহিত্যের একান্ত পাঠক ও অনুরাগী হয়ে উঠলেন। গ্যেটে শিলার হোল্‌ডারলিন দান্তে হোমার ও শেক্সপীয়রের রচনাবলী তরুণ কার্লের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। সে সময়ে স্বদেশ ও বিদেশীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের অংশাবলী কার্ল অনায়াসে মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। একদিকে গণিত অন্যদিকে দর্শন শাস্ত্রের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ ঝোঁক, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধারণাতীত অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা। এতদ্‌ব্যতীত তরুণ মার্কসের পাঠক্রমের মধ্যে গ্রীক ট্রাজেডিও বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্ল বিদ্যাভ্যাস করলেন ট্রিয়েলের Principal Grammer School এ এবং এই সময় মার্কসের জীবনে প্রেমের অভ্যুদয়। পরবর্তীকালে কার্ল মার্কসের সারা জীবনব্যাপী এই প্রেম ঐতিহাসিক ঘটনারূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। পিতৃ সুহৃদ ভেস্টাফালেনের পরমাসুন্দরী-কন্যা জেনি কার্লের দিদি সোফিয়ার সখী। জেনি কার্লের চেয়ে চার বছরের বড়। ভেস্টাফেলেনের পরিবার ধনাঢ্য। তুলনায় মার্কস-পরিবার আদৌ বিত্তশালী নয়। কিন্তু কার্ল ও জেনির প্রেমের পথে বাধা হতে পারেনি কিছুই, জেনির অকুণ্ঠ প্রেম কার্লের জীবনকে পলিকীর্ণ উর্বর ভূমিতে রূপান্তরিত করেছিল।

এখন দেখা যাক কার্ল মার্কসের কবি হবার স্বপক্ষে বর্ণিত ঘটনাবলীকে কী ভাবে সাজান যায়:

১. জন্মস্থান ঐতিহ্যময় প্রাচীন শহর
২. শহরের উপকণ্ঠ দিয়ে বয়ে চলেছে অপরূপ মোজেল নদী
৩. ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পিতার সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা, নতুন ধর্মগ্রহণ
৪. ট্রিয়ের শহরে Principal Grammer School-এ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ।
৫. পিতা ও পিতৃসুহৃদ লুডভিক ফন্ ভেষ্টাফালেনের সাহচর্য ভেষ্টাফালেনের উৎসাহে জার্মান ও বিদেশীয় ধ্রুপদী সাহিত্য অধ্যয়ন
৬. সাহিত্য গণিত ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নে ডুবে থাকা, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী
৭. ভেষ্টাফালেনের পরমাসুন্দরী কন্যা, দিদি সফিয়ার সখী, জেনির সঙ্গে প্রণয় বন্ধন
৬. উচ্চবিত্ত পিতার কন্যার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র তনয়ের প্রেমের গতিপথ সংঘাতময়

তরুণ মার্কসের জীবনধারার ঘটনাবলীর পারম্পর্য বিশ্লেষণের পর এই সিদ্ধান্তে আসা নিশ্চয়ই কোন কষ্ট কল্পনা নয় যে সে বয়সে যুবক মার্কসের পক্ষে কবি না হয়ে কোন

উপায় ছিল না। একজন মানুষের হৃদয়-বুদ্ধিকে কাব্য নির্ঝরের তন্ময়তায় উদ্বেলিত করবার পক্ষে যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা একান্ত সহায়ক রূপে উপস্থিত হয় ও ভিত্তিভূমি রচনা করে মার্কস তা পেয়েছিলেন যথোপযুক্ত ভাবেই– বোধ করি মার্কসের প্রতিভা মাফিক কিছু অধিক মাত্রায়ই।

স্বাভাবিক ভাবেই আকৈশোর মার্কস কবিতার প্রতি কাব্য ও সাহিত্য ভাবনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ও বিচক্ষণ হয়ে উঠেছিলেন। মার্কস স্বয়ং লিখেছেন ঃ Arrived in Berlin. I broke my every existing connection. Paid few and reluctant visit and tried to busy myself in science and art.

My state of mind being what it was, lyrical poetry was my first resort, at least it was the pleasantest and lay nearest.

মার্কসের প্রথম জীবনের ভাষ্যকার H. P. Adam বলেন ঃ Poetry was something a serious matter with him. If the poetic laurel was with in reach of his hand, was not this the worthiest ambition as well as the most pleasant occupation?

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসের ছাত্রাবস্থার দ্বিতীয় পর্যায়ক্রম শুরু হয়। মার্কসের বয়স তখন সতের। এই সময় কার্ল বড়ই অস্থির মানসিকতার অধিকারী। কর্ম্মরথের প্রকৃত সড়ক অন্বেষণে বিভ্রান্ত। একদিকে কাব্য সাহিত্যের জোয়ার, শ্লেগেলের কাছে জার্মানী, গ্রীক, ইংরেজী ক্লাসিক সাহিত্যের পঠন পাঠন অন্যদিকে রাজনীতি ও অর্থনীতির বাক্ বিতণ্ডা এবং জুরিসপ্রুডেন্স, এবং সব কিছুর মধ্যমণিরূপে অবস্থান করছে জেনির অপ্রতিরোধ্য প্রেমসম্ভার।

পিতা হাইনরিখ পুত্রের কাব্যচর্চা ও কাব্যতন্ময়তার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ না করলেও তিনি অন্তত এইটুকু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে কার্ল শুধুমাত্র কাব্য সাহিত্য রচনা করবার জন্য জন্ম গ্রহণ করেনি। বিশ্ববাসীর মুক্তির জন্য তাঁরই বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক কার্যক্রম একমাত্র সূত্র ও দলিলরূপে পথ প্রদর্শক হবে এতদূর ধারণা করতে না পারলেও তিনি অন্তত এইটুকু বুঝেছিলেন যে তাঁর আত্মজর মধ্যে যে দাবানল রয়েছে তা নিছক কাব্য ভাবনার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। জীবন-ভাষ্যকার H. P. Adam বলেন ঃ Moreover he (Heinrich) realised that in Karl there was what he called a Foust-like Spirit with something hard in it caused him misgiving.

পিতা হাইনরিখ অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন কার্লের কর্মজগৎ ব্যাপকতর হতে বাধ্য। কার্লের চিন্তা জগতের বিস্তার ইতিহাস তথা দর্শনের প্রতিষ্ঠিত সত্য ও ধারণাগুলিকে ভেঙে তছ্নচ্ করে দিয়ে এমন এক ভাস্বর অধ্যায়ের সূচনা করবে যার পরিমাপ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পরবর্তী বংশধরদের!

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম মার্কসের ছাত্র জীবনের তৃতীয় পর্যায়। পিতার নির্দেশে কার্ল বন থেকে বার্লিনে এলেন বটে কিন্তু এখানে এসেও তাঁর কাব্যপ্রেম বিন্দুমাত্র অবদমিত হয় নি। তিনি বার্লিনের বুদ্ধিজীবী সংগঠন Doktor klub-এ যোগদান করেন। হেগেলীয় দর্শনের একান্ত পাঠক পরবর্তীকালে দ্বিধাহীন সমালোচক হয়েও কার্ল কাব্য জগৎ ও কাব্য ভাবনার উন্নতি সাধন থেকে নিজেকে আদৌ মুক্ত রাখেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে বিশিষ্ট কবি বন্ধু হাইনে (১৭৯৭-১৮৫৬) ও ফ্রেইলগ্রাথ্কে কবিতা, কবিতার আকার গঠন ও বিষয়গত ব্যাপারে পরামর্শদান করেছেন দীর্ঘদিন।

বার্লিনে এসে অধৈর্য সত্যসন্ধানী অস্থির মার্কস দ্বিতীয় গুচ্ছ কবিতা রচনা করেন এবং শুধুমাত্র কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত হন নি বার্লিনে বসে তিনি হাস্যরস মিশ্রিত একটি

উপন্যাস ও গ্রীক ট্রাজেডি প্রকরণে একটি নাট্যকাব্য লিখতে শুরু করেন। বার্লিনে বসে অস্থির সত্যসন্ধানী মার্কস পিতাকে দীর্ঘ চিঠি লিখলেন নিজের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে ঃ 'জীবনে এমন একটা সময় আসে যা একটা পর্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা ও নতুন পথের নিশ্চিত নির্দেশক সীমান্ত প্রাচীরের মতো অবস্থান করতে থাকে। এ রকম সন্ধিকালে আমাদের ভাবনার ঈগল চক্ষুতে আমাদের অতীত ও বর্তমানকে পর্যালোচনা করি এবং আমাদের সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে পারি।...এই সব সময়ই মানুষ 'লিরিক্যাল' হয়ে ওঠে। কারণ প্রত্যেকটা রূপান্তরই কিছুটা যেন বিদায়-সংগীত (Swan Song), কিছুটা নতুন বিরাট এক কাব্যের মুখবন্ধ...বার্লিনের পথে চলেছি...আমার সমস্ত হৃদয় মন গাঢ় বেদনায় আচ্ছন্ন। যে সব পাহাড় চোখে পড়ল তার পাথরও বেশি কঠিন মনে হলো না আমার অনুভূতির চেয়ে। বড় বড় শহরগুলিকে আদৌ প্রাণময় মনে হলো না আমার রক্তের চেয়ে, সরাইখানার কলগুঞ্জন মুখরিত টেবিলগুলি বেশি ভারাক্রান্ত মনে হলো না আমার নিজের কল্পনার চেয়ে এবং সব থেকে বেশি করে যেটা বলা যায় তা হলো কোন শিল্পকর্মকেই আমার জেনি-র চেয়ে অধিক সুন্দর মনে হয় না। বার্লিনে পৌঁছে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে প্রজ্ঞা ও শিল্পের মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে সচেষ্ট হলাম। আমার এ সময়ের মনোভাব থেকে একমাত্র গীতি কবিতাকেই আকর্ষণীয় মনে হল। ... আর দূরবর্তী আমার ভালবাসাই হয়ে উঠল আমার স্বর্গ, আমার শিল্প। (মার্কসের জীবনী। Otto Ruhle)

H. P. Adam-এর গ্রন্থ থেকে জানা যায় ঃ Jenny received a bookful of manuscript poems before Christmas 1836, and Heinrich Marx another on his birth day 1837. It includes besides some three dozen lyrics, a few scenes towards a drama and a few chapters from a humorous romance.

১৯২০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ইয়োরোপের কাব্যরসিকরা যা জানতেন তা হলো– মার্কস কবিতা লিখেছেন নিঃসন্দেহে কিন্তু তার সংখ্যা এমন কিছু দৃষ্টি আকর্ষণীয় নয়। তখন পর্যন্ত মার্কসের প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা মাত্র দুটি। প্রকাশিত হয় বার্লিনে। পত্রিকার নাম Athenam কবিতা দুটির নাম Der Spielmann বা The Minstrel এবং Nachtliebe বা Night Love, প্রকাশনার তারিখ ২০শে জানুয়ারি, ১৮৪১।

পিতার মৃত্যুর (১৮৩৮) একবৎসর পূর্বে (১৮৩৭) কার্ল Skorpion and Felix নামে একখানা উপন্যাস রচনায় উদ্যোগী হন এবং যতদূর জানা যায় গদ্য রচনার ব্যাপারে কার্লের এই প্রথম প্রচেষ্টা। কাব্য রচনা ব্যতীত তরুণ মার্কস অন্যান্য যে সব সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন তার মধ্যে রয়েছে একটি ব্যাংগরসাত্মক উপন্যাস। গ্রীকট্রাজেডি প্রকরণে কাব্য নাটকের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় উপন্যাসের নাম A humorous Novel এবং ট্রাজেডি খণ্ডের নাম Oulanem। এতদ্‌ব্যতীত সমসাময়িককালে মার্কস নাট্য সমালোচনার একটি পত্রিকা প্রকাশনার পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছিলেন।

পুনরায় পিতার সতর্কবাণী এলো। তিনি পত্রে জানালেন অস্থির উদ্বেলিত চিত্তকে সংহত করে সে যেন তার প্রকৃত কর্মপন্থার রূপ নির্ণেয়ে সচেষ্ট হয় এবং সমস্ত প্রাণমন উজাড় করে একমাত্র সেই কর্মেই যেন আত্মনিয়োগ করে।

কার্ল মার্কসের কাব্যচিন্তা এবং সাহিত্য বিকাশের স্রোতধারা প্রকৃতপক্ষে এখানেই স্তব্ধ হল এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মার্কস সাহিত্যের জগত থেকে সম্পূর্ণ রূপে সরে এসে পিতৃ নির্দেশিত সত্যিকার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন।

কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর রচিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিবন্ধাবলী ও বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে লেখা অসংখ্য চিঠিপত্র থেকে জানা যায় তিনি বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদের উদ্ধৃতি সহযোগে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় কার্পণ্য করেন নি উপরন্তু অনেক সময় তিনি ভবিষ্যৎ সমাজের সাহিত্য কাব্য শিল্প কী রূপ পরিগ্রহ করবে অথবা করা উচিত সে সম্পর্কে সুচিন্তিত দার্শনিক অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন। জার্মান লোক সাহিত্য বিশেষভাবে গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের সংগ্রহ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। জার্মান লোকগাথা (sagen) তীব্র রাজনৈতিক আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আবৃত্তি করে যেতেন।
কাব্য সাহিত্য রচনা তিনি বন্ধ করেছিলেন এ কারণে নয় যে, তাতে তিনি পারদর্শিতা লাভ করতে পারবেন না। এই বিশ্বাসে বরং, নিপীড়িত মনুষ্য সমাজের বন্ধনমুক্তি না ঘটলে মানুষের কমনীয় বৃত্তির সুষ্ঠু ও সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব নয়, ফলত যা প্রাথমিক করণীয় তারই প্রস্তুতিতে তিনি জীবনের কর্মরথ চালিত করলেন।

৩.

১৮৩৯ খৃস্টাব্দের মে মাসে কার্ল গুজকাভ (Karl Gutzkow) এর বামপন্থী খবরের কাগজ 'টেলিগ্রাফ' এ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে একগুচ্ছ তীব্র সমালোচনা পূর্ণ ব্যাঙ্গাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এবং 'Letters from the Wuppertal' এর প্রথম কিস্তি প্রকাশ কালে রচয়িতার নামধাম ঠিকানা ইত্যাদি দৃষ্টি গোচরে আসেনা। ঐ একই বছর নভেম্বর মাসে জানা গেল জনৈক এস. অসওয়াল্ড (S. Oswald) এই সব রচনাবলীর সৃষ্টিকর্তা।
তৎকালীন জার্মান সাহিত্য সম্পর্কে এই ধারণা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে যে জার্মান সাহিত্য জগতে কিছু নতুন তারকার উদয় হচ্ছে এবং সামগ্রিকভাবে জার্মান সাহিত্যের পটভূমি এক বিশেষ বাঁকের সম্মুখীন।
পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নতুন ভাবধারা সম্পৃক্ত লেখকদের রচনাবলীর কোন প্রকাশক পাওয়া সম্ভব ছিল না ফলে অসওয়াল্ড বাধ্যতই টেলিগ্রাফ পত্রিকার একজন নিয়মিত ও পরিশ্রমী রিপোর্টার রূপে আবির্ভূত হন। নভেম্বর ১৮৩৯ থেকে এপ্রিল ১৮৪১ পর্যন্ত তিনি অনধিক কুড়িটি সারগর্ভ রচনা করে টেলিগ্রাফ পত্রিকাকে পরিপুষ্ট করেন। কেবলমাত্র সম্পাদক গুজকাভ জানতেন যে এই 'এস. অসওয়াল্ড' ছদ্মনামটি জনৈক ফ্যাক্টি করণিকের ছদ্মনাম এবং সে নিতান্তই একটি তরুণ যুবা যে নাকি সাধারণ কেরাণী থেকে কবির সম্মান অর্জনের জন্য স্থির নিশ্চয় হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এই অসম্ভব যুবকটি হলেন ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস্।
বার্মেন শহরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর এঙ্গেলস্ জন্মগ্রহণ করেন। জার্মান দেশের ভূপের অঞ্চলের নিম্নউপত্যকায় বার্মেন শহরের অবস্থান। জার্মানীর এতদ্অঞ্চল উন্নতমান বয়ণ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। লোক কথায় প্রচলিত ছিল বার্মেন জার্মানীর মাঞ্চেষ্টার। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই বার্মেন কার্পাসজাত বস্ত্র উৎপাদন শুরু করে। ফলে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এঙ্গেলস্ এমন এক পরিবেশের মধ্যে ভূমিষ্ট হন যেখানে ধনী নির্ধন শোষক ও শোষিতের রূপটা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত ছিল।
পিতা এতদ্অঞ্চলের একজন বিত্তবান শিল্পপতি। এঙ্গেলস্এর গুরু গম্ভীর শিল্পপতি পিতা একদিকে যেমন ছিলেন সুদক্ষ ব্যবসায়ী অন্য দিকে চার্চ ও তৎকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন শাসন পদ্ধতিতে হৃষ্ট ছিলেন। বস্তুত এগুলি তাঁর কায়েমী স্বার্থের সহায়ক ছিল।

পরিপার্শ্বিক ও পারিবারিক ঘরনার ক্ষেত্রে মার্কসের সঙ্গে এঙ্গেলসের জীবন ধারার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং অমিলটাই বেশী করে দৃষ্টিগোচর হয়।

পিতার ব্যবসাবুদ্ধি ও সেই আবহাওয়ার অনুশাসনে এঙ্গেলসকে পিতার অধস্তন কর্মকর্তারূপে কাজে যোগদান করতে হয়। তখন এঙ্গেলসের বয়স মাত্র ষোল বছর। স্কুলের পাঠ শেষ হয় নি।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এঙ্গেলস ব্রিমেন শহরে চলে আসেন। এখানে তিনি সওদাগরি অফিসের করণিকের চেয়ারে বসলেও কোন অবস্থাই তাকে ব্যাপক পঠন পাঠন থেকে বিরত থাকতে দেয় নি। ব্রিমেনে এসে তিনি স্বাধীনতার জন্য উদ্বেল হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর পড়াশুনা চালান এবং স্বভাবতই হেগেলীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন, কেননা জার্মানির দর্শন জগতে হেগেলই তখন একচ্ছত্র সম্রাট।

ব্রিমেনের অফিসঘরে কম্পানীর কাগজপত্র ব্যতীত আর যা ছিল তা হলো বিভিন্ন মূল্যবান পুস্তকে ঠাসা একটি বাক্স। এখানে বসেই এঙ্গেলস গোটের ফাউষ্ট পড়েছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের সৃষ্টির সঙ্গে। পড়েছিলেন রোমান ব্যাকরণ। একই সঙ্গে এঙ্গেলস স্বাস্থ্য অটুট রাখবার জন্য নৃত্যগীত অশ্বারোহণ প্রভৃতি ক্রীড়ার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। সাহিত্য ছিল তাঁর অন্যতম প্রথম ও প্রধান পাঠ্য বিষয়। এঙ্গেলস একদিকে হয়ে উঠলেন বহু ভাষাবিদ অন্যদিকে তীক্ষ্ণ ও নির্দয় সমালোচক। সংগীত কলার দিকে ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। এঙ্গেলস সংগীত অ্যাকাডেমিতে সংগীত চর্চায় মনোনিবেশ করেই ক্ষান্ত হন নি, সংগীত রচনা সুর সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়েও হস্ত প্রসারিত করেছিলেন।

ব্রিমেনে থাকাকালীন এঙ্গেল্স সর্বপ্রকার পুস্তকসংগ্রহের সুযোগ পান এবং এখানে তাঁর অবকাশও ছিল প্রচুর ফলে কাব্যচর্চা নির্দিষ্ট গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে এঙ্গেল্স ফ্রেইলগ্রাথকে স্মরণ করেছেন সর্বদা। কবি ফ্রেইলগ্রাথ তৎকালীন জার্মান সাহিত্য জগতে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে এঙ্গেল্স সেরকম উচ্চাকাংক্ষা পোষণ করতেন।

ফ্রেইলগ্রাথের উজ্জ্বলতা স্তিমিত হবার আগেই গুজকাভ এঙ্গেল্সের আদর্শ হয়ে ওঠেন। ব্রিমেনের ফ্যাকট্রিতে বসে এঙ্গেলস গুজকাভ এর সর্বাধুনিক রচনাবলী সংগ্রহ করেন এবং গুজকাভ এর রচনাবলীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। গুজকাভ এর বিখ্যাত প্রবন্ধ "Past and Present" (১৮৩৯) প্রবন্ধ এঙ্গেল্সের কাছে বিশেষ মূল্যবান রূপে বিবেচিত হয়েছিল।

গুজকাভ বার্লিন কোর্টে ভৃত্যদের আস্তানায় জন্মগ্রহণ করেন। রচনার উৎকর্ষের জন্য ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বয়ং হেগেলের হাত থেকে অ্যাকাডেমি পুরস্কার গ্রহণ করার কথা। হেগেল তখন বার্লিন ইউনিভারসিটির রেক্টর। এদিকে গুজকাভএর তখন একমাত্র ইচ্ছা বার্লিন থেকে পালিয়ে গিয়ে প্যারিস বিপ্লবের পুংখানুপুংখ তথ্যাদির খবরের মধ্যে আত্মনিমগ্ন হওয়া। গুজকাভ তার 'Past and present' প্রবন্ধে লুডউইগ্ বোর্ণে (Ludwig Borne) (1796-1837) কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। এবং এই একই বছর জর্জ গিল্টফ্রিড্ জারভিনাস এর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'History of the Poetic National Literature of the Germans' এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। জারভিনাসের এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ জার্মান যুবকদের কাছে এক বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাণ্ডাররূপে দেখা দেয়। সমস্ত জার্মানীতে গ্রন্থখানি বিপুল আলোড়ন তোলে। জার্মান যুবকবৃন্দ রুদ্ধনিশ্বাসে গ্রন্থখানি পাঠ করে ফেলেন। জারভিনাস দাবী করেন তথাকথিত অভিজাত সাহিত্যের কাল শেষ হয়েছে। সাহিত্য কোন উঁচু মহলের তুষার গ্রহে আবদ্ধ থাকার বিষয়

নয়। বস্তুত অভিজাত সাহিত্য বলে (bells letters) কোন বস্তুর অস্তিত্বকে আর স্বীকার করা যায় না। রাজনীতি, রাজনৈতিক সংঘাত ও তার কর্মসূচী এবং তার প্রয়োগ কৌশল তথাকথিত অভিজাত সাহিত্যের স্থান দখল করে নেবে, দখল করে নেবে প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মেই। প্রসঙ্গত বিশ্বের সাহিত্যকর্মের ইতিহাসে জারভিনাস রচিত যুগান্তকারী উপসংহারের কথা স্মরণ করি ঃ

"আমরা একথা বিশ্বাস করতে চাই না যে এ জাতি শিল্প সাহিত্য ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৃহত্তম মনীষার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং একথাই বলা যায় রাষ্ট্রের বিকাশ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষাগতভাবে এ জাতি কিছুই দিয়ে যেতে পারেন নি...সময় চিহ্নিতকরণ ও সময়ের নির্দেশ অনুভাবনার দায়দায়িত্ব আমাদের নিজেদের উপর। আমাদের কর্মসূচী ও কার্যক্রমকে শতধা বিভক্তিকরণ থেকে বিরত হও, এবং আমাদের সংহত প্রচেষ্টা সেই দিকে ধাবিত হোক যা নাকি আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের অস্থির আকাঙ্ক্ষা উদ্বেলিত হয়ে উঠুক। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমাদের সেই দিকে যাত্রা করা প্রয়োজন যে পথে কোন বিদগ্ধ মানস আদৌ পদাচারণ করেন নি।"

ত্রিশ দশকের শেষ ভাগে লুডউইগ্ বোর্ণে জার্মানীর লিবারেলদের কাছে বিশেষ সম্মানিত সত্যদ্রষ্টারূপে বিবেচিত হন। জার্মান মূল্যবোধের সঙ্গে তাদের নিয়ত সংগ্রামের কথা বোর্ণে পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করেছিলেন ফলে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসের সময় ফ্রাংকফুর্ট শহরে ইহুদীদের সিভিল রাইটস খারিজ হয় এবং বোর্ণেকে তার মিউনিসিপ্যালিটি অফিস থেকে অপসারিত করা হয়। এঙ্গেল্‌স বোর্ণের বিখ্যাত গ্রন্থ Dramaturgical Leaflets (১৮৩৬) পাঠ করেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে। ১৮৩৯ সালের নভেম্বর মাসে এঙ্গেল্‌স স্থির নিশ্চয় হন যে সাহিত্যের অন্যতম কর্তব্য হলো শ্রমিক কৃষকের বক্তব্য ও অবস্থাকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এঙ্গেল্‌স দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন সাহিত্য নিশ্চয়ই 'অশিক্ষিতদের দিকে হস্ত প্রসারিত করবে।' এই সময় তিনি বোর্ণের সমস্ত রচনাবলী সংগ্রহ করেন এবং বিশেষ করে তাঁর বহু বিতর্কিত রচনা 'Menzel the French Eater' পাঠ করেন। সমস্ত জার্মান যে ইয়োরোপ জাতির বস্তি অঞ্চল (Ghetto) বোর্ণে সেই কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। এই সময় এঙ্গেল্‌স অনুভব করলেন যে রাজনীতিতে সরাসরি যোগদান করা ভিন্ন অন্য কোন পথ খোলা নেই এবং বোর্ণের পদাংক অনুসরণ করে তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্যে প্রগতিশীলতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার বিস্তার ঘটান।

এই সংকলনের প্রথম কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অগাষ্ট মাসে 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকায়। কবিতাটি ছন্দ ও প্রকরণের দিক থেকে উচ্চমান কবিতা ভাবনার নিদর্শন। কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক সচেতনতার চিহ্ন নেই। শীঘ্রই এঙ্গেল্‌সের কবিতা সরাসরি শোষণ ও শোষিতের চিত্র তুলে ধরে। এঙ্গেল্‌সের সাহিত্য কর্ম মানুষের প্রতিদিনের সুখ দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং পরবর্তীকালে সামগ্রিকভাবে এঙ্গেল্‌স সুসভ্য পৃথিবীর আধুনিক সর্বহারাদের অন্যতম প্রধান শিক্ষক ও পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হন।

৪.

সর্বহারা সংস্কৃতি সম্পর্কে ১৯২০ সালের ৮ই অক্টোবর রচিত এবং ১৯২৬ সালে প্রচারিত লেনিন নির্মিত খসড়া-সিদ্ধান্তগুলির প্রথমটি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি:

"শ্রমিক ও কৃষক পরিচালিত সোভিয়েত গণতন্ত্রে সর্ববিধ শিক্ষা ব্যবস্থা,–সে রাজনীতির ক্ষেত্রেই হোক বা সাধারণ পড়াশুনার ক্ষেত্রেই হোক, এবং বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে, শ্রেণীসংগ্রামের চেতনায় প্রেথিত থাকা উচিত; যে সংগ্রামের হোতা সর্বহারার দল–যাদের মূললক্ষ্য সর্বহারা একনায়কত্ব কায়েম করা, অর্থাৎ বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন ও তাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলা, শ্রেণী বৈষম্য দূরীভূত করা এবং ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তির সর্ব প্রকার শোষণকে নির্মূল করা।"

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (লেনিন) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল, মতান্তরে ২২শে এপ্রিল রাশিয়ার মহানদী ভলগার তীরে সিম্‌বিস্ক শহরে (বর্তমান নাম উলিয়ানভস্ক) জন্মগ্রহণ করেন।

লেনিনের পিতামহ ছিলেন আদি রুশবাসী নিজগোরদ গুবোর্নিয়ার ভূমিদাস কৃষক। পরবর্তীকালে ইনি অস্ত্রাখান শহরে চলে আসেন এবং নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় রূপে চিহ্নিত হন এবং কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে মারা যান। পিতা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভের শৈশব আর্থিক দুর্গতির মধ্যে অতিবাহিত হয়। নিজের মেধা ও অধ্যবসায়ের জোরে তাঁর উচ্চশিক্ষালাভ সম্ভব হয়েছিল। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে প্রথমে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কালে স্কুল পরিদর্শক ও সিম্‌বিস্ক গুবের্নিয়ার স্কুল পরিচালক পর্যায়ে উন্নীত হন। তৎকালীন সমাজের চোখে ইলিয়া নিকোলায়েভিচ ছিলেন প্রগতিশীল ব্যক্তি।

লেনিনের মা মারিয়া আলেক্সন্দ্রাভনা চিকিৎসক পরিবারের তনয়া। বাড়িতে বসেই যা কিছু শিক্ষালাভ করেন। একাধিক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। সাহিত্য ছিল প্রিয় পাঠ্য বিষয়। সংগীতে অনুরাগ অসামান্য। বুদ্ধিমতী, শান্ত ও স্নেহশীলা মাতা শিশু সন্তানদের মানুষ করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

উলিয়ানভ পরিবারের সন্তান সন্ততির সংখ্যা ছয়টি। আন্না, আলেক্সন্দার, ভ্লাদিমির, ওলগা, দমিত্রি ও মারিয়া। বাবা মা সন্তানদের সত্যিকারের মানুষ হবার মতো শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরিশ্রমী, সৎ, বিনয়ী এবং সংবেদনশীল মানুষরূপে ওরা বড় হয়ে ওঠে।

পাঁচ বছর বয়সে ভ্লাদিমির পড়তে শেখেন এবং নয় বছর বয়সে সিম্‌বিস্ক জিমনাসিয়ামে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র রূপে লেনিন প্রতিটি পরীক্ষায় পুরস্কার অর্জন করেন। এই সময় থেকেই লেনিন রুশ মনীষী ও সাহিত্যিকদের রচনা গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। পুশকিন, লেরমন্তভ, তুর্গেনিভ, নেক্রাসভ, সালতিকভ শ্যেদ্রিন এবং তলস্তয় লেনিনের প্রিয় লেখক ছিলেন। সাহিত্য ব্যতীত বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের রচনাসমূহ লেনিন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন। এঁদের মধ্যে বেলিনস্কি, হের্ৎসেন, চের্নিশেভস্কি, দ্রবলিউবভ, পিসরেভ বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এঁদের রচনাবলী তৎকালীন রুশদেশে নিষিদ্ধ ছিল। চের্নিশেভস্কির বিখ্যাত গ্রন্থ 'কী কর্তব্য' লেনিনের প্রিয়তম পুস্তকগুলির অন্যতম। চের্নিশেভস্কির অন্যান্য প্রবন্ধ ও রচনা লেনিনের বিপ্লবী মানসিকতা তৈরি হবার পক্ষে সহায়ক ছিল।

লেনিনের বিপ্লবী চেতনার ভিত্তি মূলে যার প্রভাব অপরিসীম তিনি হলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলেক্সন্দার। লেনিনের দিদি আন্না ইলিনিচনা উলিয়ানভা স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ সাশার (আলেক্সন্দার) প্রতি ভ্লাদিমিরের ছিল প্রবল অনুরাগ ও ভালবাসা এবং প্রতিটি বিষয়ে সাশার দৃষ্টান্ত ওর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আলেক্সন্দার পড়াশুনা করতেন পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। জীবনের শুরুতেই তিনি জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের উন্নতমান

জীবনের দাবীতে বেছে নিয়েছিলেন বিপ্লবী কার্যক্রম ও লড়াই। দাদার কাছ থেকেই লেনিন মার্কসবাদী তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিচিত হন।

ষোল বছর বয়সে তথাকথিত ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে লেনিন গলা থেকে ক্রুশ ছিঁড়ে ফেলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আকস্মিক পিতৃবিয়োগ। একটি শোকের পরিসমাপ্তি না ঘটতেই এলো দ্বিতীয় আঘাত, ১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে পিটার্সবুর্গে আলেক্সন্দার গ্রেফতার হন ও জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রাণনাশের গুপ্ত কার্যকলাপে সংযুক্ত, এই অভিযোগে ঐ একই বছর মে মাসে শ্লিসেলবুর্গ দুর্গে আলেক্সন্দারের ফাঁসি হয়। আন্না লিখেছেন ঃ বীরের মতো মৃত্যু বরণ করে আলেক্সন্দার। তাঁর রক্তের দাবদাহ আলোকিত করে পরের ভাই ভ্লাদিমিরের পথ।

শুরু হলো মেহনতী মানুষের মুক্তি সন্ধানের পথ অন্বেষণ, সঙ্গে যুক্ত হলো সমাজ বিজ্ঞানের উপর পড়াশুনা। সোনার পদকসহ স্কুলের পাঠ শেষ হলে ১৮৮৭ সালের অগাস্ট মাসে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। এখানে ভ্লাদিমির বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রগতিশীল বিপ্লবী-মানসিকতাপূর্ণ ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ছাত্র সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবার জন্য লেনিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ও গ্রেফতার হন। পরবর্তীকালে লেনিন গল্প করেছিলেন, জেলখানার দারোগা তাঁকে বলেছিলেন– "হৈ হাংগাম করে আর কী হবে ছোকরা। শেষটা তো এই দেওয়াল। উত্তরে লেনিন বলেছিলেন, "হ্যাঁ, দেওয়াল তবে ঘুনেধরা। ধাক্কা দিলেই ভেঙে পড়বে!'

ইলিচ অন্তরীণ হলেন কাদান গুবের্নিয়ার[১] ককুশকিনো গ্রামে (এখনকার নাম লেনিনো)। এই ছোট্ট গ্রামটিতে বসে লেনিন পড়াশুনায় ডুবে গেলেন। এক বছর পর কাজানে ফেরার অনুমতি পান। ভ্লাদিমির উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশপাড়ি দেবার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি মিলল না। লেনিন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি রূপে ঘোষিত হলেন।

রাশিয়ায় মার্কসবাদী দর্শনের প্রথম বিশিষ্ট প্রচার নায়ক হলেন প্লেখানভ। জারের নির্যাতন থেকে আত্মগোপন করে প্লেখানভ এবং তার সঙ্গীরা জেনেভায় ১৮৮৩ সালে 'শ্রমমুক্তি' নামে প্রথম রুশ মার্কসবাদী দল গঠন করেন। এই সংগঠনের প্রধান কাজ ছিল মার্কস-এঙ্গেল্সের রচনাবলী রুশ ভাষায় তর্জমা করে গোপনে দেশে পাঠান। তরুণ লেনিন মার্কসবাদী তত্ত্বে খুঁজে পেলেন ভাবাদর্শের সর্বোত্তম রূপ। মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থটি লেনিন গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন।

১৮৮৯ সালের মে মাসে লেনিন তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে সামারায় আসেন। এই সময় তিনি গভীরভাবে পড়াশুনা করবার অবকাশ পান ও একাধিক ভাষা শেখেন। লেনিন মার্কস ও এঙ্গেল্সের যুগান্তকারী গ্রন্থ 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। চার বছরের পাঠক্রম দুই বছরে শেষ করে ১৮৯১ সালে পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৮৯২ সালে সামারা সদর আদালতে গরিব চাষীদের পক্ষে ওকালতি শুরু করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অগাষ্ট মাসে লেনিন সামরা থেকে পিটার্সবুর্গে চলে আসেন। লেনিন পিটার্সবুর্গে উদারনৈতিক নারোদবাদীদের সঙ্গে বাদানুবাদ লিপ্ত হন এবং মার্কসবাদী পার্টি গঠনে আত্ম নিয়োগ করেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি নাদেজদা কনস্তানতি নোভনা ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে পরিচিত হন। ক্রুপস্কায়া তখন নেভস্কি ফটকের ওপারে শ্রমিকদের রবিবাসরীয় সান্ধ্য-স্কুলের শিক্ষিকা। পরবর্তীকালে ক্রুপস্কায়া লেনিনের সহধর্মিনী ও বিশ্বস্ত সহযোগী যোদ্ধারূপে আবির্ভূত হন।

---

[১] জার রাশিয়ার প্রশাসনিক আঞ্চলিক বিভাগ।

১৮৯৫ সালে সুইজারল্যাণ্ডে লেনিন 'শ্রমমুক্তি' সঙ্ঘের সদস্য প্লেখানভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুইজারল্যান্ড থেকে প্যারিস ও বার্লিনে যান। আন্তর্জাতিক সর্বহারার মহাগুরু ও নায়ক ফ্রেড্রিখ এঙ্গেল্স তখন ভীষণ অসুস্থ, ফলে লেনিন এঙ্গেল্সের সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পান নি। ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লেনিন পিটার্সবুর্গে ফিরে আসেন এবং পূর্ণ উদ্যমে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

হাজার কাজের মধ্যেও লেনিন শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য ব্যায়াম চর্চা করতেন ও মনকে প্রফুল্ল রাখার জন্য সংগীত চর্চা। ঘুমতে যাবার আগে ব্যায়াম ছিল তাঁর প্রত্যাহিক রুটিনের অংশ।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রাচ্য সাইবেরিয়ায় তিন বছরের জন্য লেনিনের বিরুদ্ধে নির্বাসনাজ্ঞা জারি হয় এবং ঐ বছর মে মাসে লেনিন শুসেনস্কয়ে গ্রামে নির্বাসনে চলে আসেন। প্রায় একই সময় 'শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি সংগ্রাম সঙ্ঘের' ব্যাপারে ক্রুপস্কায়া গ্রেফতার হন এবং তাঁকেও এই শুসেনস্কয়ে নির্বাসিত করা হয়।

নির্বাসনে থাকাকালে লেনিন 'রাশিয়ার পুঁজিবাদের বিকাশ'সহ অনধিক ত্রিশখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯০০ সালের ২৯শে জানুয়ারি নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হয়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'ইস্ক্রার' প্রথম সংখ্যা। অত্যাচার ও গুম হবার আশংকায় লেনিনসহ 'ইস্ক্রার' পরিচালকবর্গ জার্মানীর মিউনিখ শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৯০১ সালে ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর রচনাবলীতে 'লেনিন' এই নাম স্বাক্ষর করেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে কেন লেনিন এই নাম গ্রহণ করেছিলেন। যে তথ্য জানা যায় তা হলো– প্লেখানভ তাঁর রচনার শেষে স্বাক্ষর করতেন 'ভলগিন' নামে, রুশমহানদী ভল্গার নামানুসারে। মনে হয় লেনিন বেছে নিয়েছিলেন সাইবেরিয়ার নদী 'লেনা'কে। লেনা থেকে লেনিন।

বর্তমান গ্রন্থের সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ কবিতাটি ছাড়া লেনিনের অন্য কোন সাহিত্য কর্মের সন্ধান পাওয়া যায় কি না তা আজও গবেষণার বিষয়, তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণে রাষ্ট্র ও সমাজের উপর রচিত প্রবন্ধাবলী যদি সাহিত্য সৃষ্টির আখ্যায় ভূষিত হবার যোগ্যতা রাখে তাহলে লেনিনের মতো দিগ্বিজয়ী সাহিত্য রচয়িতা দ্বিতীয় দেখি না।

সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুস্পষ্ট এবং ঐ দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি হিসেবেই পাই শিল্প সাহিত্যের চরিত্র নির্ণয়কারী পূর্বল্লিখিত খসড়া-সিদ্ধান্তগুলি। লেনিন বিভিন্ন সময়ে দেশ ও বিদেশের কবি সাহিত্যিকদের উক্তি সহযোগে তাঁদের সাহিত্য কর্মের উদ্ধৃতিসহ নিজের মতামত ও বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াস পেয়েছেন। টলস্টয়ের উপরে ১৯০৪ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত লেনিনের লেখা প্রবন্ধমালা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা সাহিত্য রূপে বিবেচিত হবে। এতদ্‌ব্যতীত লেনিনের প্রতিটি রচনার মধ্যে একদিকে যুক্তি ও বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকতা অন্যদিকে কাব্যময় আবেগের নির্ঝর। লেনিনের অন্তর্লোকে সর্বদা একটি সংবেদনশীল নির্ঝরিণী প্রবাহিত ছিল। লেনিনের কবিতা সর্বহারা সাহিত্যকর্মের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সদাসর্বদা লেনিন ছিলেন কবিদের সুহৃদ। প্রসঙ্গত গর্কীর সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক বাদানুবাদের কথা স্মরণ করা যায়। গর্কী বলতেন, উৎকৃষ্টমানের গদ্যসাহিত্যের চেয়ে মধ্যমান কাব্য রচনা করা সহজতর কাজ। গর্কীর এই উক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন লেনিন। গর্কীর এই উক্তি তাঁকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে। লেনিন সমস্ত দেশের সর্বকালের কবিদের আত্মার আত্মীয়।

১৯০৭ সালের গ্রীষ্মকাল। লেনিন আত্মগোপন করেছেন ফিনল্যাণ্ডে। জারের আদেশে দ্বিতীয় ডুমা বা রুশ পার্লিয়ামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে ও লেনিন প্রমুখ নেতাদের গ্রেফ্তার করবার জন্য জারের পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেনিন ফিনল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে বাল্টিকের তীরে সেইবিস্তা গ্রামে ছদ্মনামে বসবাস করেন কিছু কাল। বস্তুত তখন লেনিন কিছুটা অবসর যাপনের সুযোগ পান। পার্টির একজন কর্মী এখানে তাঁর সঙ্গীরূপে বসবাস করতেন। একদা বালটিক তীরে ভ্রমণকালে, পার্টি জনগণের মধ্যে প্রচারকার্য হিসেবে কবিতার ফর্মকে যথাযথ রূপে ব্যবহার করছে না ইত্যাদি আলোচনা হয় এবং লেনিন আরও বলেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী সোশ্যাল রেভল্যুশনারীদল এ বিষয়ে অনেক বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। উত্তরে সঙ্গী বলেন, সে তো আর কবিতা রচনা করতে পারে না! লেনিন বলেন, যার লেখায় যথেষ্ট হাত আছে, যথেষ্ট পরিমাণে বৈপ্লবিক চেতনা দৃষ্টিভঙ্গি ও সংবেদনশীলতা আছে তার পক্ষে বৈপ্লবিক কবিতা বা কাব্যরচনা করা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। সুযোগ পেয়ে সঙ্গী কমরেড স্বয়ং লেনিনকে চেষ্টা করে দেখবার জন্য অনুরোধ করেন। লেনিন এই অনুরোধ রক্ষা করেন ও 'কাব্য' রচনায় সচেষ্ট হন। তিনদিন বাদে তিনি স্বরচিত কবিতাটি সঙ্গীকে পড়ে শোনান।

এই দীর্ঘ কবিতায় লেনিন ১৯০১-১৯০৭ সালে বিপ্লবের একটি জ্বালাময়ী চিত্র তুলে ধরেছেন। এই অংশকে তিনি বলেছেন প্রথম 'বসন্ত'। তারপর রূপ দিয়েছেন প্রতিক্রিয়ার, এই অংশকে লেনিন 'শীত' রূপে অভিহিত করেছেন।

লেনিনের এই কবিতাটি জেনেভার রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের পত্রিকা 'রাদুগা' (রামধনু)য় প্রকাশিত হবার কথা ছিল। পিয়তর আল রাদুগার সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু পত্রিকাটি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায়। পিয়তর আলের প্রকৃত নাম গ্রেগোয়ার আলেক্শিনস্কি এবং তাঁর দপ্তরেই কবিতাটি বন্দী অবস্থায় পড়ে থাকে। Larche নামক ফরাসী পত্রিকায় কবিতাটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। পূর্বে অন্য কোন ভাষায় এটি অনূদিত হয় নি।

৫

সমস্ত পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও এমন একটি সচেতন মানুষের সন্ধান পাওয়া মুসকিল হবে যিনি 'স্তালিন' এই শব্দ বা কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঝংকৃত হয়ে ওঠেন না। স্তালিন সর্বকালের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম বিস্ময়। স্তালিনকে ঘিরে আজকের দুনিয়ায় গবেষণা, বাদানুবাদ, তাঁর চিন্তাধারার ভ্রান্তিতা অভ্রান্তি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরেও মতদ্বৈধের অন্ত নেই। কিন্তু শত্রুমিত্র নির্বিশেষে একথা মানতে বাধ্য হয়েছেন স্তালিন এমন এক ব্যক্তিত্ব, স্তালিন এমন এক অধ্যায় যার বিচার ও পরিমাপের সময় কবে শেষ হবে সঠিক করে তা বলা দুরূহ। আজ পর্যন্ত সঠিক করে যেটুকু বলা যায় তাহলো– স্তালিন সর্বহারা বিপ্লবের অন্যতম অবিসংবাদিত নেতা। স্তালিন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বাস্তবায়িত করণের সার্থক সফল কারিগর।

অথচ কী আশ্চর্যের বিষয়, বলতে দ্বিধা নেই, –বস্তুত বলতে লজ্জায় নত হতে হয় যে, এই 'স্তালিন' নামের সঙ্গে এক রোমহর্ষক ভয়ের দাবদাহ দুনিয়াব্যাপী বহমান। এমন কি 'স্তালিন' এই শব্দে স্বদেশী ও বিদেশীয় কুটনীতিবিদগণ এমন এক ইমেজ ব্যবহার করছেন যার অনুসঙ্গে কোন মানবতাহীন ভয়ঙ্কর নির্দয়তাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। কিন্তু সত্যই কি তাই? এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন রাজনীতি ও সমাজবাদের সৎ গবেষকবৃন্দ এবং ঐ মূল প্রশ্ন পেরিয়ে এসে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো– এ হেন ব্যক্তির অন্তর্লোক কি

কখনো কাব্যরসের নির্ঝরিণী-বিধৌত হয়েছে? স্তালিন কি কোন সময় কাব্য রচনায় হস্ত প্রসারিত করেছেন? স্তালিনের জীবনী ও পাঠক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় স্তালিন কবিতা লিখেছেন একটি দুটি নয় কয়েক গুচ্ছ। ছাত্রাবস্থায় স্তালিনের অন্যতম পাঠ্য বিষয় ছিল সাহিত্য। তরুণ বয়সে স্বাভাবিকভাবেই একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ঘটনা ফুল, চাঁদ, নক্ষত্র, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত মানুষের মনকে আন্দোলিত করে– বিশেষতঃ সংবেদনশীল কবিমনকে, –কিন্তু ঐ সংবেদনশীলতা একটা বিশেষ স্তরে প্রাকৃতিক বিষয় বস্তু ছাড়িয়ে মানুসিক বিষয়বস্তুতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, –অন্যথায় শিল্পী প্রকৃত শিল্পীরূপে আখ্যায়িত হবার অধিকারী নন। এক্ষেত্রে স্তালিনও আদৌ কোন ব্যতিক্রম নন। স্তালিনের কবিতায় প্রভাত আলো ফুল পাখির গান চাঁদ ইত্যাদি যথা নিয়মেই এসেছে এবং ক্রমে ঐ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিলীন হয়ে কাব্য-ভাবনা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। কিন্তু তার আগে স্তালিনের কৈশোর যৌবনের দিনগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়া দরকার।

জোসেফ ভিসিরিয়ান যুগাশভিলির সারা বিশ্ব জোসেফ স্তালিন নামে খ্যাত। মা বাবার পরিচয় সাধারণের চেয়ে সাধারণ। বাবা নিতান্তই দরিদ্র চর্মকার। মা ক্যাথারিনা কৃষকের মেয়ে। সুতরাং স্পষ্টতই স্তালিন সর্বহারা ঘরের সন্তান, যাঁর চরিত্র গঠনের পেছনে কোন ঐতিহ্যের দোহন নেই। পিতা ভিসিরিয়ান ঘরে বসে জুতো সারাই লব্ধ অর্থ দিয়ে সংসার প্রতিপালন করতেন। পরবর্তীকালে কারখানায় চাকরি গ্রহণ করেন। এই সময় মা ক্যাথারিনা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর মাত্র বিশ বছর বয়সে চতুর্থ সন্তানের জন্মদান করেন। পূর্ববর্তী সন্তান-এর ভূমিষ্ট হবার অল্প ব্যবধানে আঁতুড়ঘরেই প্রাণ হারায়। পরপর তিনটি সন্তান হারিয়ে বাবা মা 'সো সো'কে এমনভাবে মানুষ করবেন ঠিক করলেন যেন সে একজন দক্ষ চর্মকার হয়ে ওঠে।

পরাধীন জর্জিয়ার তৎকালীন অবস্থা বড় ভয়াবহ। একদিকে জারের প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের যথেচ্ছাচার অন্যদিকে প্রকৃতির অতুল ঐশ্বর্য। রূঢ় কঠিন বাস্তব পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে শৈশব অতিবাহিত করতে হয়েছে 'সো সো'কে। অতুল বৈভব ও নিদারুণ দারিদ্র্যের সহাবস্থান দুঃখজর্জর জীবনের ভয়াবহতার পাশাপাশি কিশোর 'সো সো' পেয়েছেন ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিচিত্র প্রকৃতিকে আর পেয়েছেন মাকে। শৈশব থেকেই জীবন কি, জীবন কেন, কেন এই অর্থ বৈষম্য, কেন এই পরাধীনতা, শোষণ, অত্যাচার– প্রভৃতি প্রশ্ন বালক 'সো সো'কে ভীষণভাবে আন্দোলিত করে। দুরপনেয় দারিদ্র্য ও রূঢ়তার মধ্যেও মা ক্যাথারিনা 'সো সো'কে গোরীর গির্জা-সংলগ্ন স্কুলে পাঠালেন। এখানে দীর্ঘ সাত বছর শিক্ষা গ্রহণকালে বিশেষ করে রুশ ভাষার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান তিনি। এবং এই সময় জননী স্বয়ং শিশুপুত্রকে জর্জিয়ান ভাষা শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মনোজগৎ যত বেশি আলোকপ্রাপ্ত হতে লাগল বালক ততই অনুধাবন করতে লাগলেন যে জর্জিয়া পরাধীন, –জর্জিয়া অত্যাচারিত, সে পরাধীন জাতির একজন। এ হেন ভাবনা কিশোর মনে গভীর ক্ষতি সৃষ্টি করে।

বহু উপজাতির বাসভূমি এশিয়া মহাদেশের উত্তর পশ্চিমে জর্জিয়া ছোট একটি প্রদেশ। ১৮ হাজার ফুট উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সমন্বিত ককেশাস পর্বতমালার সানুদেশে অতুল প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত উপত্যকা জর্জিয়ার উর্বর ভূখণ্ডের বিস্তার কৃষ্ণসাগরের সীমানা পর্যন্ত। তখনো বাকুর তেলের খনি বিশ্বখ্যাতি লাভ করেনি। ম্যাঙ্গানিজ তামা লোহা ইত্যাদি খনিজ সম্পদের পাশাপাশি মাইলের পর মাইল উর্বরভূমিতে বপন করা হয়েছে আঙুর, আর রয়েছে পথে পথে হিংস্র শ্বাপদের প্রতুলতা। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকারী ঈগলের দর্শনীয়

ভঙ্গীমা বালক সোসোকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। পরবর্তীকালে লেনিনের ব্যক্তিত্ব ও মহিমার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে স্তালিন 'পার্বত্য ঈগল' এই কাব্যিক ব্যঞ্জনাময় শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

বুদ্ধিমান সাহসী ও পরিশ্রমী এই জর্জিয়ার ইতিহাস ভাঙাগড়ার ইতিহাস। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের উপর দিয়ে আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর প্রভৃতি দুর্ধর্ষ দস্যু-নৃপতিগণ অত্যাচার ও হত্যার বন্যা বইয়ে দিয়েছে কতবার, তথাপি এই অকুতোভয় জাতি তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার মাধ্যমে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছে। গোরী শহরের সর্বত্র ঐ যুদ্ধবিগ্রহের চিহ্নাবলী বর্তমান এবং পর্বতশীর্ষে প্রাচীন বাইজানটাইন দুর্গ অবস্থিত। স্তালিনের শৈশব, কৈশোর ও তাঁর মানসিক স্তর বিন্যাসের পরিচয় জানতে হলে জর্জিয়ার এ হেন ইতিহাসকে স্মরণ না করে উপায় নেই।

স্তালিনের বয়স যখন সাত সাংঘাতিকভাবে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন তিনি। এই বসন্তের দাগ সারাজীবন ধরে তাঁর মুখমণ্ডলে অবস্থান করে শৈশব-কৈশোরের নিপীড়ন ও দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

গোরীর স্কুলের ছাত্র বালক সোসোর গড়ন ছিপছিপে রোগা। সারা মাথায় ঘন কৃষ্ণবর্ণ চুল। জ্বলন্ত ছোট্ট দুটি চোখ। দৃঢ় চোয়াল, উন্নত নাসিকা ও চাপা অধরোষ্ঠ সমন্বিত বালক স্তালিন শৈশব-থেকেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পবাক। ক্লাসের পড়াশোনা ব্যতীত অরণ্য পর্বতে ভ্রমণ ও খেলাধূলা স্তালিনের বিশেষ প্রিয় ছিল।

এগার বছর বয়সে পিতা জোসেফ ভিসিরিয়ান যুগাশ্‌ভিলির পরলোকগমন করেন। ফলে ছোট্ট পরিবার হলেও মা ক্যাথারিনা বালক পুত্রসহ নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবে যান। কিন্তু একমাত্র প্রাণের নিধি– তাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো খাদ্য সরবরাহ ও স্কুলের পড়াশোনা– একে তো স্তব্ধ হতে দেওয়া যায় না! প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ, কাপড় ধোয়া ইত্যাদির সাহায্যে কাথারিনা ছেলেকে মানুষ করতে লাগলেন। অন্যদিকে বালক স্তালিনের মনোজগতে বিভিন্ন চিন্তার প্রতিফলন বুকের মধ্যে ঢেউ তুলছে। বহিঃপ্রকৃতিতে পৃথিবী এক অপরূপ, সৌন্দর্য এত অকৃপণ, অরণ্য-পর্বতে বিহংগকুল প্রাণ-মনের সমস্ত ভালবাসা ও আকাংক্ষা উজাড় করে গান গেয়ে বেড়ায়– কিন্তু মানুষের এত দুঃখ এত কষ্ট কেন? কেউ সুখের ইমারতে জীবনযাপন করে ক্লান্ত কেউ বা শুধুমাত্র উদরান্নের সংস্থানের জন্য জন্তুর মতো জীবন কাটায়। কেন? সভ্যতার সংকটের সেই আদিম ও অন্তিম প্রশ্ন। এ অন্যায়, এ হতে পারেনা।

এই অবস্থার প্রতিকার ভিন্ন মানবজাতির সুখ নেই– মানবজাতির শান্তি নেই।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। স্তালিন গোরী পরিত্যাগ করে টিফ্‌লিসে এলেন ও পাদ্রী পাঠক্রম গ্রহণ করবার মানসে টিফ্‌সিল সেমিনারে ভর্তি হন। টিফ্‌লিস জর্জিয়ার রাজধানী। গোরীতে অবস্থান কালেও স্তালিন একাধিকবার টিফলিস আসা-যাওয়া করেছেন। টিফলিসের এক গ্রন্থাগার থেকে স্তালিন ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' ও 'মানবমনের উৎপত্তি' বই দু'খানি সংগ্রহ করে পাঠ করেন। জ্ঞান গরিমায় ও হাবভাবে ১৪ বছরের কিশোর যেন ১৮ বছরের যুবা।

এই সময় তুর্কীর আক্রমণে প্রায় একলক্ষ আরমেনিয়াবাসীকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমস্ত জাতি সোচ্চার হয়ে ওঠে। তরুণ স্তালিনের মন থেকে এই হত্যাকাণ্ডের বীভৎস স্মৃতি কোনদিন নির্বাপিত হয়নি। দেশত্যাগী হাজার হাজার উদ্বাস্তু টিফ্‌লিস শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বস্তুত টিফলিসে স্তালিন পাদ্রী পাঠক্রমের আবহাওয়ার মধ্যে অবস্থান করলেও তাঁর চিন্তাধারার স্রোতের মুখে কোন বাধাকেই তিনি গ্রাহ্য করেননি। স্তালিন তাঁর পঠন পাঠনের অগ্রগতিকে রেখে স্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল পাঠচক্র গড়ে তোলেন। ছাত্রদের মধ্যে

রাজনৈতিক পাঠ শুরু হয়। কিন্তু এই কাজে বাধা প্রবল। বাধা যত তীব্র ছাত্রশ্রেণী তত বেশি উদ্বুদ্ধ হতে লাগল। এদিকে এই পাঠচক্রের ছাত্রবৃন্দ নানাদিক থেকে অত্যাচারিত হতে শুরু করেছে। সচেতন শিল্প সংস্থাগুলির উপর দমনপীড়ন ও নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। স্তালিন অবশ্য তখন পর্যন্ত কোন দলভুক্ত হননি। পাদ্রী হবার ইচ্ছা পুরোপুরি বিসর্জন দিলেও স্তালিন অত্যন্ত তীক্ষ্ণতার সঙ্গে সমস্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এইসময় তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং ইতিহাস পাঠে নিমগ্ন ছিলেন। ছুটির দিনে সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে অরণ্য পর্বতে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। পর্বতের সানুদেশে উপস্থিত হয়ে তার ঢালে শরীর বিছিয়ে দিয়ে স্তালিন একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে যেতেন। চেরনিসেভেস্কি, পিসারেভ, টলস্টয়, শেখভ, গোগল প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের সেরা রূপকারদের রচনার মধ্যে স্তালিন নিজেকে নিমজ্জিত করে রেখেছিলেন। অন্য দিকে তৎকালীন বিভিন্ন আন্দোলনের ইস্তাহার, নিষিদ্ধ পুস্তকাদি রহস্যময়ভাবে ছাত্রাবাসে প্রবেশ করতে লাগল। মাঝেমাঝে ছাত্রাবাসের ঘরগুলিতে পুলিশ খানা তল্লাসি করে যায়।

প্রায় বছরখানেক পরে আবহাওয়ার উন্নতি ঘটে। অবশ্য কলেজ কর্তৃপক্ষ কিন্তু নিশ্চেষ্ট বসে নেই। একদা রেক্টর স্তালিনকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর স্তালিন দোষী সাব্যস্ত হলো। এই ধরনের অপরাধে স্তালিনকে কিছুদিন কারাবাসে কাটাতে হয়।

এদিকে মূল রুশ ভূখণ্ডে তখন মার্কসপন্থীদের সংগঠন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। দলের কর্মপন্থা, পরিচালনার দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র স্তালিন নিষিদ্ধ মার্কসপন্থী দলের সান্নিধ্যে আসেন এবং ক্রমে টিফ্সিলের সংগঠনে যোগদান করেন। মার্কসপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগের অব্যবহিত পরেই স্তালিন মার্কস, এঙ্গেলস, প্লেখানভ ও কাউট্স্কীর রচনা সম্ভারের সঙ্গে পরিচিত হন। সেকালে এইসব গ্রন্থ সংগ্রহ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিনতম কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। টিফ্লিস শহরে মাত্র একখানি 'ক্যাপিটাল' সংগৃহীত হয়। সদস্যরা হাতে লিখে কপি করে ভাগাভাগি করে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এই সময় স্তালিন একটি প্রগতিপন্থী মার্কসীয় পাঠচক্র গড়ে তোলেন ও একটি হাতে লেখা সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। এবং ক্রমে লেনিনের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হন। লেনিন তখন দূর ভূখণ্ড সেন্ট পিটর্সবুর্গে।

এই সব বিপ্লবী কার্যধারার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই দেখা দিল। হস্টেলের দু'জন ছাত্রকে পুলিশ বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেফতার করল। ১৮৯৮ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর কলেজের অধ্যক্ষ খবর পেলেন রাত ৯ টার সময় হস্টেলে একদল ছাত্র স্তালিনকে ঘিরে নিষিদ্ধ পুস্তকাদি পাঠ করে। ১৮৯৯ সালের ২৭শে মার্চ ফাদার দিমিত্রি কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সভায় প্রস্তাব তোলেনঃ রাজনীতিগত অবিশ্বাসের কার্যকলাপের জন্য যোসেফ যুগাশভিলিকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হোক! স্তালিন বহিষ্কৃত হলেন। এই ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম।

আঠারো বছরের যুবক কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কর্মীরূপে যোগদান করেন শ্রমিক অঞ্চলে। পরবর্তীযুগে কোন ছাত্রসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তালিন বলেছেন– "আমার মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার মূলে রয়েছে আমার সামাজিক অবস্থা। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমার বাবা ছিলেন জুতোর কারখানার মিস্ত্রী, মা-ও মজুর। চারিদিকে তখন স্বাধিকার রক্ষার আবহাওয়া, বিদ্রোহ। আমি যাদের মধ্যে বড় হয়েছি তারা সকলেই আমার বাবার মতো শ্রমিক-মজুর। যে রক্ষণশীল কলেজে আমি কয়েক বছর পড়েছি সেখানেও অসহিষ্ণুতা ও জেসুইট সুলভ জুলুমবাজী। আমার চারদিকের আবহাওয়া জারীয় পীড়ন-নীতির বিরুদ্ধে ঘৃণায় পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং আমি সমস্ত প্রাণমন দিয়ে বিপ্লবের কর্মপন্থা গ্রহণ করলাম।"

স্তালিনের প্রথম কবিতাটি ইভেরিয়া পত্রিকায় ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। ইভেরিয়ার তৎকালীন সম্পাদকের নাম Prince Ilya Chavchavadze। স্তালিন তখন পনের বছরের কিশোর। কবিতাটি জর্জিয়-জাতীয়তা বোধের জন্য খ্যাত এবং জর্জিয়ার কবিতা সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। স্তালিন তাঁর কবিতার মধ্যে জর্জিয়ার শিক্ষিত লোকের কাছে যে আবেদন রেখেছেন তার মূলে একটি প্রবচন চালু আছে, তাতে বলা হয়েছে যে জর্জিয়ার মুক্তি নির্ভর করে জর্জিয়াবাসীর শিক্ষার উপর এবং স্বাধীনতার চাবি কাঠি হলো শিক্ষা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় স্তালিন কবিতাবলীর নীচে J. G. Shishvili এই নাম স্বাক্ষর করতেন।

দ্বিতীয় কবিতাটি প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১১, ১৮৯৫। যতদূর জানা যায় কবিতাটি স্তালিনের বিশেষ প্রিয়। এই কবিতাটির তৃতীয় স্তবকের চারটি পঙ্‌ক্তি স্তালিন তাঁর নিজের নামে রুশ ভাষায় অনূদিত জর্জিয়ার কবিতা সঙ্কলনে ছাপা হবার অনুমতি দেন ১৯৩৯ সালে। স্তালিন তাঁর জীবদ্দশায় রুশবাসীকে উল্লিখিত ঐ চারটি পঙ্‌ক্তি পাঠের অনুমতি দান করেন এবং সম্ভবত ঐ অনুবাদ কর্ম নিখুঁত ছিল না। ইভেরিয়ার প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল তার পূর্ণ অনুবাদ এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হলো। স্তালিনের যতগুলি কবিতা পাওয়া যায়, আলোচ্য কবিতাটি তার মধ্যে দীর্ঘতম। এবং এই কবিতাটিতে স্তালিন নিজের নাম স্বাক্ষর করেছিলেন।

তৃতীয় কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালের ২৯শে অক্টোবর। কবিতাটি আর ইরিস্‌টাভির উদ্দেশ্যে রচিত।

স্তালিনের কবিতাগুলির চরিত্র বিন্যাসে দেখা যায় স্বাজাত্যবোধ পূর্ণ গীতিকবিতার মেজাজই সেখানে অধিক মাত্রায় বর্তমান। সেমিনারের প্রথম বছর তার পাঠ্য বিষয় ছিল কাব্য এবং কলেজে পড়ার সময় তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করলেও খুব সামান্য কবিতাই গুছিয়ে রাখা হয়েছে। কেবলমাত্র চার কিম্বা পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এবং ইভেরিয়ার পত্রিকার উপর গবেষণা চালালে দেখা যাবে কম করে বিশ পঁচিশ কবিতা উদ্ধার করা সম্ভব।

আমরা যদি এমন ধারণা পোষণ করে থাকি যে স্তালিনের কবিতাগুলি অত্যন্ত বিপ্লবাত্মক তাহলে খুব ভুল হবে। তবে লিরিক কবিতা লিখেই তিনি দায়িত্বমুক্ত হয়েছেন এমন ধারণাও ভ্রান্ত। স্তালিনের কবিতার মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেম বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং কাব্য রচনার পরিণতিতে তিনি সর্বহারা বিপ্লবের কাছেই প্রত্যাশী হয়েছে ও সর্বহারা বিপ্লবের উপর তাঁর দৃঢ় আস্থা ঘোষিত হয়েছে।

৬

প্যারিস, জুলাই ১৯৪৬।

স্থান রয়াল মনসিয়াউ (Royal Monceau) অভ্যর্থনা কক্ষ। সময় বিকেল। জনৈক সুস্বাস্থ্যবান উজ্জ্বল সাংবাদিক প্রায় পনের মিনিট ধরে একটি শীর্ণ মানুষকে হাজার প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। শীর্ণ মানুষটির সারা অঙ্গ জুড়ে প্রভূত কষ্টের ছাপ এবং মুখে অসংখ্য বলিরেখা।। লোকটির সম্মুখে রয়েছে এক গুচ্ছ রক্তাক্ত গোলাপের পুষ্পাধার।

আশেপাশে বিভিন্ন দেশের প্রায় শতাধিক সাংবাদিক এবং পর্যবেক্ষক।

"মাননীয় রাষ্ট্রপতি, আপনি তো একজন কমিউনিস্ট। তাই না?" সাংবাদিক প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ", শান্তভাবে জবাব দিল লোকটি।

"আপনি কি কখনো প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন?"

"করেছি।"
"কত দিন ধরে?"
"প্রায় চল্লিশ বছর।"
"আচ্ছা আপনি কি কোনদিন কারাবরণ করেছেন?"
"হ্যাঁ।"
"কোন জেলে?"
"সে অনেক।"
"দীর্ঘদিন?"
এবার শীর্ণ লোকটি উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান যুবকটির দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে ফেলল। বলল– "জেলে সময় সর্বদাই দীর্ঘ মনে হয়। আশা করি, তোমার এটা জানা আছে।"
উত্তরদাতার ভাষা ফরাসী। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, বক্তব্য তীক্ষ্ণ। সাংবাদিক ঠিক এতটা আশা করেনি। লোকটি কি সত্যই উত্তর দিয়েছে না রসিকতা করল বা বিদ্রূপ? কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছে তা হলো ফরাসী ইংরেজ আমেরিকান যারা ঐ অভ্যর্থনা কক্ষে উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল যে ছাগশ্মশ্রু সমন্বিত পণ্ডিত লোকটি হেনয়ে বসে যেমন হাসেন ঠিক একই ভাবে হাসতে পারেন প্যারিসে বা লণ্ডনে বসেও। এ হাসি যেন ব্যাখ্যাতীত কোন প্রাজ্ঞের যাঁর সত্যদৃষ্টি যুগোত্তীর্ণ ব্যাপ্তিতে লক্ষ্যবিদ্ধ।
"সাংবাদিক, আপনার কি অন্য কোন প্রশ্ন রয়েছে? হ্যাঁ, জেলে সময় সর্বদাই দীর্ঘ।"
আগস্ট ১৯৪২।
যুদ্ধের দ্বিতীয় বছর শেষ হতে চলেছে। জাপানীরা ইন্দোচীনের স্বত্ত্ব গ্রহণ করেছে। এদিকে কিন্তু নবাগত সৈন্যবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটল। এবং ভিয়েৎনামের উচ্চ ভূমিতে প্রতিরোধ ঘাঁটিঅঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
চীন-ভিয়েৎনাম সীমান্ত অঞ্চলে একদা চিয়াংকাইশেকের পুলিশ একজন লোককে গ্রেফতার করে। ওরা কেবল জানতো লোকটিকে হো-চি-মিন বলে ডাকা হয় এবং সে চুং-কিং যাত্রী। লোকটি নিজেকে ভিয়েৎনামের দেশপ্রেমিকদের প্রতিনিধি বলে দাবী করে।
কে এই হো-চি-মিন?
১৯২৬ বা ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি নেগুয়েন আই কুয়াক নামে একজন ভিয়েৎনামী দেশপ্রেমিকের কথা শোনা যায়। নেগুয়েন আই কুয়াকের নাম সুদূর প্রাচ্যের পুলিশ বাহিনীর ভালই জানা ছিল। এই আই কুয়াক পৃথিবীর প্রায় সবক'টি ফুটন্ত এলাকা পরিভ্রমণ করে এসেছেন। কিন্তু নেগুয়েন নামক দেশপ্রেমিককে তো মৃত বলেই ঘোষণা করা হয়েছে।
ধৃত মানুষটিকে অত্যন্ত বয়স্ক দেখাচ্ছিল। তার পোশাক-আশাক নিতান্তই সাধারণ। কিন্তু তার সমস্ত চেহারার মধ্যে এমন একটা উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণতার ছাপ পরিস্ফুট যে তাকে সাধারণ লোক বলে বিশ্বাস করে নেওয়া সম্ভব নয়। এবং তার চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো– সে চুং কিং অবস্থিত চীনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ অভিলাষী। বস্তুত এহেন মতলবই একজনকে গ্রেফতার করার পক্ষে যথেষ্ট!
প্রথমে তাকে সিং সি জেলে রাখা হলো। তারপর কোন কারণ ব্যতিরেকেই পাঠান হলো নানিং জেলে। নানিং থেকে কুইলিন এবং কুইলিন থেকে লিউচৌ। লিউচৌ এ এসে তিনি তার পশ্চাদভূমির পদাংক খুঁজে পেয়েছিলেন।
তখনো ভোর হতে বাকি। নক্ষত্ররাজি অদৃশ্য হতে শুরু করেছে। লোকটিকে এগিয়ে দিয়ে আসা হলো কিছুটা পথ। হাত দুখানা বাঁধা। পেছনে দু'জন রক্ষী একটা শুকর ছালকে বয়ে

নিয়ে চলেছে। রাত্রি নামে পাখিরা নীড়ে ফিরে আসে– তাকে রাবিশের স্তূপের মধ্যে একটা খাঁচার জেল তৈরি করে আটকে রাখা হলো। এবং এক পায়ে বেড়ি থাকার জন্য সে খুশি হলো এই কারণে যে কোন খানাডোবার মধ্যে পড়ে থাকার চেয়ে আপাতত বাঁচোয়া।

ঘূর্ণি হাওয়ার মতো এখানে ওখানে বদলী হয়ে সে কোয়াংসি প্রদেশের তেরটি জেলা অতিক্রম করে। এই সময় তাকে সদরে ও ত্রিশটি হাজতে মোট চৌদ্দ মাস আটক রাখা হয়। এখান থেকেই সে সীমান্তের পথে ফিরে যায়, যে সীমান্ত অঞ্চল দু'বছর পূর্বে অতিক্রম করেছিল।

সারাদিন জুড়ে পঞ্চাশ কিলোমিটার হাঁটা। নিঝুম রাত্রি। ক্ষুধা, শীত, জ্বর কোন কিছুই তার মুখের হাসিকে কেড়ে নিতে পারেনি। এ হাসি তার অজেয় জীবনশক্তির প্রকাশ এবং এ হাসি যেন অশুভ ও মৃত্যুর উর্ধ্বে কোন দিগ্বিজয়ের চিহ্ন।

হাত পা বাঁধা থাক না– কিন্তু পাখির গান শোনা কে বন্ধ করবে? সুগন্ধি পুষ্পের ঘ্রাণ? নির্জনতা কি তোমার উপর অকর্মণ্যতার বোঝা চাপায়? হেমন্তের চাঁদ আকাশে উজ্জ্বল। অপরাহ্নের অবসাদ কি তোমার ইচ্ছাশক্তিকে বিকল করবে? আলকাতরার মতো অন্ধকার রাত্রে যে ঘরটি আলোকিত তার দিকে দৃষ্টি ফেরাও!

অরণ্য ক্লান্ত উড্ডীন পাখিরা নীড় খোঁজে
খোলা আকাশে এক টুকরো নির্জন মেঘ ভেসে চলে যায়–
দূরে ঐ পার্বত্য পল্লী, একটি বালিকা গম পিষ্‌ছে
গম পেষা শেষ হলো, এখন উনুনে গন্‌গনে আগুন।

পুলিশের খাতায় তোমার হাবভাব গতিপ্রকৃতির পূর্ণ বিবরণ ও খুঁটিনাটি টোকা আছে। এক ঘণ্টার নির্জনতা কে ভোলাতে পারে? এ এক অসহনীয় অবস্থা। ঐ হাসির পেছনে যেন এক বিরাট নাটকের উন্মোচন। বস্তুবাদের কবিতা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জন্মলাভ করে। এবং কবিতা যদি কদাপি জীবনের প্রয়োজনে না লাগে তো বুঝতে হবে স্থিতস্বার্থ অপরিবর্তিত থেকে গেছে।

সেকালে চীনদেশের জেলখানাগুলি প্যারিসের প্রধান কয়েদখানা সাঁতের (Sante) সেলের মতো অলৌকিক বিচারালয়ে পরিণত হয়েছিল। এই জেলগুলির দেওয়ালে রক্তের দাগ, দুঃখ দুর্দশার চিহ্ন, পায়খানা পেচ্ছাব, নোংরামি, অসুখের ডিপো এবং জুয়ারী, পকেটমার, আফিংখোর, সিফিলিস রুগী সকলকে একসঙ্গে রাখা হতো যেমন এক পরিবারভুক্ত লোক। চা খেতে ইচ্ছে হয় তো স্টোভ রয়েছে বানিয়ে খেতে পার।

কখনও বা বিকেলে অন্ধকারে বসে বন্দীরা এইসব ঘুমন্ত বা জেগে থাকা কয়েদীদের দেখে, দেখে অপাপবিদ্ধ সরল মুখগুলি মেঝের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে, ছারপোকাবাহিনী রাতের অন্ধকারে যেন দেওয়াল জুড়ে অভিযান চালাচ্ছে এবং মাথার উপর মশকের স্কোয়ার্ডন। পৃথিবীতে যুদ্ধ, এদিকে সে জেলের অন্ধকারে পচ্‌ছে স্বদেশ এবং বন্ধুবান্ধব থেকে বহু দূরে। ঠিক সেই সময় লোকটি তার জীর্ণ নোটবইটি বের করে অভিজ্ঞতার কাহিনী জেলের দিনপঞ্জী লিখে রাখছে। লিখে রাখছে ঐ জেলের জেইলারের ভাষায়। জেইলারের ধারণা ঐ নোটবইতে সব কিছুই ভিয়েৎনামী ভাষায় লেখা।

এই হলো শতাধিক গাথা এবং অমিল ছন্দবদ্ধ তাঙ্ কবিতা রচনা ইতিহাসের গোড়ার কথা। এই কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল চীনের ধ্রুপদী ঢঙে। কবিতাগুলিতে পরিচিত অনুষংগে নতুন শব্দচয়নের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কবিতাগুলিতে বিধৃত হয়েছে বন্দীজীবনের আলেখ্য। এই বন্দী লোকটি ভিয়েৎনামের দেশপ্রেমিক নেগুয়েন ভিন্ন অন্য কেউ নয়। এই লোকটিই প্যারিসের রয়াল মনসিয়াউ

(Rayal Monceau) অভ্যর্থনা কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তর দিচ্ছিলেন ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের অপরাহ্ণে, প্রকৃতপক্ষে এই সম্মেলন ছিল ফরাসী ও ভিয়েৎনামীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও পূর্ণবিবেচনার বৈঠক।

১৯৪৬ সনের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতি হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম সরকারের একটি প্রতিনিধিদল ঐ বছরের ৬ই মার্চ, প্রাথমিক চুক্তি আলাপ আলোচনার উদ্বোধন করবার জন্য ফরাসী দেশে উপস্থিত হন এবং এই চুক্তিই ১৪ই সেপ্টেম্বরের 'মোডাস ভিভেনদি'র (Modus Vivendi) জন্মদান করে। (Fontainedleau Conference). দুর্ভাগ্যের বিষয় ফরাসী উপনিবেশিকের দল এই চুক্তিকে টরপেডোর ন্যায় গুপ্ত আক্রমণ চালিয়ে নিহত করে। সারা দেশ জুড়ে ভিয়েতনামীদের প্রতিরোধ আক্রমণ ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৪৬) থেকে উত্তাল হয়ে ওঠে এবং শেষ হয় ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসের দিয়েন বিয়েন ফু'র জয়লাভের মধ্যে।

অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে এমন একটি সহজ সরল মানুষের গন্ধ পাই– যার প্রকৃত নাম হো-চি-মিন। উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যার নাম সর্ব-পরিচিত। কবিতাগুলি সাধারণভাবে উপস্থাপিত করা হলো– পাঠকবৃন্দ নিজেরা এর সার্থকতা ও ব্যর্থতা বিচার করবেন এবং সমালোচনা করবেন।

এই মুহূর্তের পৃথিবীতে হো-চি-মিনের স্মৃতিচিহ্ন কতই না দাগ রেখে যাচ্ছে। স্মৃতিমালা হলো ইতিহাসের ইতিহাস– এ সত্য তো আমাদের সকলেরই জানা।

মনীষীগণ তাঁদের কর্মের দ্বারা চিহ্নিত হন, চিন্তা ও চরিত্রের দ্বারা চিহ্নিত হয়। কবিতা হলো এমন একটি সম্পদ যা মানুষের খুব প্রিয় এবং নিকটের। কবিতা কখনো মিথ্যা বলে না, অন্যথায় কবি কখন কবি নন।

হো-চি-মিন ঠিক এমনই একজন মানুষ– এমনই একজন কবি যার বুদ্ধিবৃত্তি ও সংবেদনশীলতার মধ্যে কোনো ব্যবধান তৈরি হয়নি। যার ব্যক্তিক ও সার্বিক জীবনের মধ্যে কোন গোপনতা নেই। যাঁর কাছে দুঃখের দৃশ্য আক্রমণ ও কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে।

৭

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর হুনান প্রদেশের শাওশান গ্রামে মাও-সে-তুঙ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা একজন সামান্য কৃষকরূপে জীবন শুরু করে বিত্তশালী জমিদার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। মাও-সে-তুঙের পিতা বছর দুই স্কুলে পাঠাভ্যাস করেছিলেন এবং সামান্য লেখাপড়া জানতেন। মা একজন আত্ম-নিমগ্ন বৌদ্ধ। শিক্ষালাভের কোন সুযোগ আসেনি জীবনে। শৈশবে মাও মায়ের পদাংক অনুসারী হয়ে বৌদ্ধধর্মে আস্থাবান হলেও পিতার সঙ্গে শৈশব থেকেই মতবিরোধ দেখা দেয়। সমালোচকদের কেউ বা বলেন মাও-চরিত্রের বিপ্লবী চেতনার সূচনা এই পিতৃবিরোধের মধ্যেই নিহিত ছিল। বস্তুত এ ধারণা অর্থহীন। পিতার সঙ্গে কৈশোর-দ্বন্দ্ব সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সর্বহারা বিপ্লবের নেতা ও প্রবক্তার চরিত্র গঠনের ভিত্তি হতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও রাষ্ট্রচরিত্রই কোন মানুষকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ক হয়।

আট বছর বয়সে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাও-সে-তুঙ পড়াশুনা আরম্ভ করেন। স্কুলে কনফুসিয়াসের রচনা পড়ান হতো এবং ছাত্ররা না বুঝে তা মুখস্থ করত। এই নীরস পাঠক্রম-ক্লান্ত ছাত্রবৃন্দ অবসর বা সুযোগ পেলেই স্বদেশ ও বিদেশের গল্প উপন্যাস ইত্যাদি পাঠে নিমগ্ন হতো। স্কুলপাঠ্য বর্হির্ভূত পুস্তকাবলীর মধ্যে Romance of the

Three kingdoms এবং Water Margin (All Med are Brothers) গ্রন্থদ্বয় মাও-এর মনে দারুণ আধিপত্য বিস্তার করে।

পনের বছর বয়সে স্কুলের পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে মাও পিতার জমিজমা দেখাশোনা ও হিসাবপত্রের সহায়ক রূপে কাজে যোগদেন এবং বাঁধাধরা গণ্ডীর বাইরে মনের মতো বাছাই করা উপন্যাস গল্প ছাড়াও তৎকালীন রাজনৈতিক পুস্তকাদির উপর পড়াশুনা চালিয়ে যান। এই সময়কার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে Words of warning to an Affluent Age বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাও-সে-তুঙের স্বয়ং স্বীকৃতি আছে যে এই পুস্তকটি তাঁকে পুনরায় স্কুলে ফিরে যেতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে এবং মাও বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে একজন আইনের ছাত্রের কাছে লেখাপড়া শুরু করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় মাও সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। ষোল বছর বয়সে, পিতার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, তিনি একটি আধুনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

এই স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ হবার পর থেকেই মাও সে-তুঙের বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার বিকাশ বিশিষ্ট রূপ পেতে শুরু করে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষের ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য নানা ধরনের নির্যাতন ও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মাও ও তাঁর সহপাঠীবৃন্দ দুর্ভিক্ষ ও বিদ্রোহে নির্যাতন এবং দমনমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদির পুংখানুপুংখ পর্যালোচনা করেন। মাও বলেছেন– এই বিদ্রোহীরা অতি সাধারণ মানুষ– অবিচার এদের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে। স্বৈরাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে কো-লাও-হুইর সদস্যবৃন্দ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মাও ও তার সহপাঠীরা এই বিদ্রোহে সমর্থন জানায়। বিদ্রোহের নেতাকে, যাকে পরবর্তীকালে হত্যা করা হয়েছিল, বীররূপে অভিহিত করেন।

ইত্যকার ঘটনায় মাও-এর মানসলোক গভীরভাবে বিচলিত ও আন্দোলিত হয়। সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে মাও নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেন। ১৯১০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় শাওশানবাসী অধিক শস্য সরবরাহের দাবী জানায় কিন্তু মাও-এর পিতা এই দাবী অগ্রাহ্য করে সমস্ত খাদ্যশস্য শহরে চালান দেন। ক্রুদ্ধ ক্ষুধার্ত গ্রামবাসী শস্যপূর্ণ একটি জাহাজ আটক করলে মাও-এর পিতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মাও ঘোষণা করলেন– "বাবার একাজ অত্যন্ত অমানবিক এবং ঘৃণ্য"। পাশাপাশি মাও এই সত্যও অনুধাবন করেন যে– গ্রামবাসীরা যে পন্থা অবলম্বন করেছে– তাতে সামগ্রিকভাবে কোন পরিবর্তন সংগঠিত হবে না। পৃথিবীর ঘটনাবলীর উপর মাওএর দৃষ্টি ক্রমে ব্যাপক ও বিশ্লেষণাত্মক হয়ে ওঠে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের আফিং যুদ্ধ, ১৮৬০ সালের এ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ আক্রমণকালে সামার প্যালেস (Summer Palace) পুড়িয়ে দেওয়া, জাপানীদের পরাভব (১৮৯৫) এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বক্সার অভ্যুত্থান পরিষ্কার এই চিত্র তুলে ধরে যে চীনের পরাধীনতা, নির্ভরশীলতা ও অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য কঠিন ও কঠোর বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হওয়া ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই।

কয়েক বছরের মধ্যেই গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন প্রতিপত্তিশালী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে ওঠে এবং দেশের ভাগ্য নির্ধারণ সম্পর্কে মতদ্বৈধতা পরিলক্ষিত হয়। কাঙ্, কিয়াঙ্ ও ১৮৯৮ সালের আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পক্ষে, সান-ইয়াৎ সেন এবং তাঁর অনুগামীরা গণতন্ত্রের পক্ষে।

টুংশান উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসকালে মাও সর্বপ্রথম আধুনিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। এই সময় মাও একজন জাপান ফেরৎ শিক্ষকের কাছ থেকে ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের জয় লাভের কথা শোনেন এবং জাপানীদের শৌর্যবীর্য

তাঁকে উৎসাহিত করে ও ভাবিয়ে তোলে। Great Heroes of the world গ্রন্থে মাও ক্যাথারিন এবং পিটার দ্য গ্রেট-এর কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হন, পরিচিত হন ওয়েলিংটন ও নেপোলিয়নের সঙ্গে, গ্লাডস্টোন, রুশো ও লিঙ্কনের সঙ্গে। জর্জ ওয়াশিংটনের কাহিনী মাওকে বিশেষভাবে চিন্তিত করে। জর্জ ওয়াশিংটনের কথা মাও এইভাবে বিচার করেছেন– "ওয়াশিংটন জয়ী হয়েছেন এবং তাঁর দেশকে গড়ে তুলেছেন, গড়ে তুলেছেন দীর্ঘ আট বছরের তিক্ত যুদ্ধের পর।" এই ভাবনার মূলকথা হলো চীনের মুক্তি ও তার গঠন কার্যের জন্য চাই শক্তিধর কোন মহান ব্যক্তির নেতৃত্ব। চীনের ভাগ্য যেন কোরিয়া বা ভারতবর্ষের মত না হয়।

টুংশান বিদ্যালয়ে পড়বার সময় মাও লক্ষ্য করেছেন সহপাঠীবৃন্দ সকলেই জমিদার নন্দন, মূল্যবান পোশাকে শোভিত হয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। দুম্‌ড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাওয়া মাওয়ের একটি মাত্র পোশাক। স্কুল-শিক্ষার ক্ষেত্রে মধ্যপথে পিতাদ্বারা বিঘ্নিত হওয়ায় মাও ক্লাসের মধ্যে শরীরে দীর্ঘ এবং বয়সেও বড়। এই লম্বা অদ্ভুত একগুঁয়ে ও ভীষণ ছেলেটি সহপাঠীদের হাস্যরসের খোরাক হয়ে ওঠে। মাও-এর প্রতি তাদের আচরণ রূঢ় হয়।

পরের বছর ১৯১১ সালের প্রথম দিকে মাও চাংসায় ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং চাং সায় পৌছে মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন। চাংসাতে বেশি দিন অতিবাহিত না করলেও মাও-এর সামগ্রিক জীবনে চাংসা এক ঐতিহাসিক অধ্যায়।

চাংসাতে এসে মাও সর্বপ্রথম সংবাদপত্র পাঠ করেন। সংবাদপত্রটি ছিল সান-ইয়াৎ সেন গোষ্ঠীর মুখপত্র। এই সংবাদপত্রের মাধ্যমেও মাও হুনানদের দ্বারা কেনটন আক্রমণের সংবাদ জানতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী সংবাদ হলো ১৯১১ সালের বিপ্লব, ১০ই অক্টোবর হুনানে যার সূচনা। ইত্যাকার সংবাদ পাঠে মাও এমনই প্রভাবান্বিত এবং উত্তেজিত হয়েছিলেন যে ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি একটি নিবন্ধ রচনা করে ফেললেন। ঐ রচনাটি পরিষ্কার করে কাগজে লিখে স্কুলের দেয়ালে সেঁটে দিলেন। অবশ্য এই প্রবন্ধ রচনা সম্পর্কে মাওয়ের বক্তব্য হলো– ব্যাপারটা অপরিচ্ছন্ন এবং গোলমেলে। রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা থেকে মাও সরাসরি রাজনৈতিক কার্যকলাপের দিকে অগ্রসর হন। উহান অভ্যুত্থানের অল্প ব্যবধানে একদল বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবক চাংসার মাও-সে-তুঙের স্কুলে উপস্থিত হন এবং স্বাদেশিকতাপূর্ণ উদ্দীপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত হয়ে মাও উহানের বিপ্লবীসেনা দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উহানে বিপ্লবীসেনা দলে যোগদান ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই চাংসাতে বিপ্লবের ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। মাও পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে চাংসার বিপ্লবীদের জয়লাভের চিত্র চাক্ষুষ দর্শন করেন।

১৯১২ সালের বসন্তকালে মাও ভাবলেন বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং সেনাবাহিনীতে কাজকরা আর কোন অর্থ হয় না। মাও ছ মাসের সৈনিক জীবনে ইস্তফা দিয়ে পড়াশুনার জগতে ফিরে আসতে চাইলেন। কিন্তু কোন শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন তিনি, তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও রূপ কী হবে, কোন জীবন ধারার বাহক হবেন তিনি? সত্য অন্বেষণে অস্থির মাও এই সময় পর্যায়ক্রমে পুলিশের কাজ করেন, কাজ করেন সাবান তৈরির কারখানায়, এবং 'তিন বছরে সমস্ত আইন বিষয়কপাঠ পূর্ণ হবে'– এই বিজ্ঞাপনে সাড়া দেন ও বাণিজ্যে অভিজ্ঞ হবার ইচ্ছায় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু ইংরেজীভাষা শিক্ষার মাধ্যম থাকায় যে ভাষা মাও প্রায় কিছুই বুঝতে পারতেন না) মাত্র একমাস ক্লাস করে ঐ স্কুল পরিত্যাগ করেন মাও চাংসার প্রথম প্রাদেশিক মাধ্যমিক স্কুলে আরও ছয়মাস অতিবাহিত

করেন। কিন্তু অস্থির সত্যসন্ধানী কোন ছকবাঁধা পড়াশুনার গণ্ডীর মধ্যে মনকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। স্থির করলেন স্বাধীনভাবে লেখাপড়া করবেন। হুনানের প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাঠে মগ্ন হয়ে রইলেন। ডারউইন, মিল, রুশো প্রভৃতি মনীষীদের রচনাবলী পাঠ করেন। রুশ, আমেরিকা; ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন।

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালে মাও নিজেকে শিক্ষক রূপে তৈরি করবার জন্যে চাংসার চতুর্থ প্রাদেশিক নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। এদিকে পিতা মাও-এর এমত সিদ্ধান্তে যারপরনাই রুষ্ট। ঐ বছরই হেমন্তকালে মাও প্রাদেশিক নর্মাল স্কুলের প্রথম স্তরে উন্নীত হন ও ১৯১৮ সালে স্কুল পর্যায়ের স্নাতকত্ব অর্জন করেন। মাও কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। চাংসার প্রথম নর্মাল স্কুলের শিক্ষক ইয়াং চাং-চির চরিত্র মাওকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ইয়াং-চাং-চি ছিলেন নীতি শিক্ষার অধ্যাপক। ইয়াং-চাং-চির কন্যা মাওয়ের প্রণয় পাত্রী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে মাও তাঁকে বিবাহ করেন। ১৯৩০ সালে জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে হত্যা করে।

সে সময়কার চীন ৪ঠা মে'র আন্দোলনে টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। প্যারিস শান্তি আলোচনার বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে পিকিং-এ ছাত্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। মাও ৩রা জুনের ব্যাপকহারে ছাত্র গ্রেফতারি কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি শেষ দিকে কিম্বা মার্চের প্রথমে মাও পিকিং-এর পথে রওনা হন ও ফরাসীযাত্রী কিছু সংখ্যক বন্ধুর সঙ্গে সাংহাই যান। ৪ঠা মে'র উপর মাওয়ের লেখা বিখ্যাত প্রবন্ধ "The Great Union of the Popular Masses"-র প্রথমাংশ ২১শে জুলাই প্রকাশিত হয় মাও সম্পাদিত Hsiang River Review নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায়।

সাংহাই অবস্থান কালে মাও লণ্ড্রীতে রজকের সাহায্যকারীর কাজ যোগাড় করে ভরণপোষণের সংস্থান করেন। এখানে তিনি প্রথম নর্মাল স্কুলের শিক্ষক আই-পোই-চির সংস্পর্শে আসেন। আই-পোই-চি কুয়োমিনটাং-এর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। চাংসার প্রত্যাবর্তনের পর মাওকে তিনি প্রথম নর্মাল স্কুলের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালকের পদে মনোনীত করেন। ফলে স্বভাবতই মাওয়ের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে ও আর্থিক অনটনও অপেক্ষাকৃত লাঘব হয়।

আত্মজীবনীতে মাও লিখেছেন "১৯২০ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে কী তত্ত্বগত কী কর্মক্ষেত্রে, আমি মার্কসবাদী হয়ে উঠি। এই প্রথম আমি নিজেকে মার্কসবাদীরূপে ভাবতে পারলাম।" ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত মাও চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ সালে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

চীনের জনজীবনে ও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসে পরবর্তী বৃহত্তর ঘটনা হলো সোভিয়েত আনুকূল্যে কুয়োমিন্টাং এর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা। ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাস 'Left Kuomintang'এর সঙ্গে চিয়াং-এর সম্পর্ক খোলাখুলিভাবে বিসংবাদের পর্যায়ে পৌঁছায়। ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি কুয়োমিনটাংয়ের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির (Kuoumintang Cengral Executive Committee) তৃতীয় প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। হুনান প্রত্যাগত মাও এই প্লেনামে কৃষক সমস্যা এবং কৃষক আন্দোলনের উপর দীর্ঘ ও সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

মাও কুয়োমিনটাং মন্ত্রীসভার কোন সদস্যপদে মনোনীত না হলেও এই প্লেনামে মাও-এর উপস্থিতি ও 'Regulations for the Repression of Local Bullies and Bad Gentry'র সমর্থন বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে, মাও ঘোষণা করেন

শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে স্থানীয় অত্যাচারী ও অভিজাতদের দূরে ছুঁড়ে ফেলা সম্ভব হবে না।' বৈপ্লবিক কর্মপন্থার মাধ্যমে তাদের ব্যবস্থা করতে হবে– ব্যবস্থা করতে হবে পরিপূর্ণভাবে কৃষকদের দ্বারা সরাসরি আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

নানা সাবধানবাণী সত্ত্বেও কুয়োমিনটাংয়ের সঙ্গে আঁতাত বজায় রাখার জন্য মস্কো পুনঃপুনঃ পরামর্শ দিতে থাকে।

এই সব আলাপ আলোচনা বাদানুবাদের অবসান ঘটিয়ে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে কুয়োমিন্টাং এর সৈন্যবাহিনী সাংহাই-এর শ্রমিকদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। অন্ধকার বিষাদময় গম্ভীর পরিবেশে উহানে এপ্রিল মাসেই চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় মাও-সে তুঙ, চুতে ও অন্যান্য ভূস্বামীদের (warlord) সহযোগিতায় নিজস্ব সৈন্যবাহিনী (Fourth Red Army) গঠন করেন। আক্রমণ প্রতি আক্রমণ কখন জয় কখন পশ্চাদপসরণ কখনবা রণনীতি ও রণকৌশলের পরিবর্তন ও পরিমার্জন, ক্ষয়ক্ষতি আশা-নিরাশা প্রভৃতি অবস্থার মধ্য দিয়ে চীনের সশস্ত্র কম্যুনিস্টপার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৈঠকে মিলিত হন এবং আক্রমণাত্মক কর্মসূচী গ্রহণের পূর্বে বিগত দিনের ভুল ভ্রান্তির বিশদ আলোচনা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ জরুরী মনে করেন।

১৯২৮-২৯ সালে শীতকালে পার্টি পলিটব্যুরো হেমন্তের অভ্যুত্থানে মাও-সে-তুঙের কার্যধারাকে পুরোপুরি স্বীকার করে নেয়। কেন্দ্রীয় কমিটিতে ফিরে এলেও ১৯৩৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত মাওয়ের নেতৃত্ব পুরোপুরি দানা বাঁধেনি। মাও ঘোষণা করলেন– "চীনের দরিদ্র কৃষক সমাজই বিপ্লবী শক্তির অগ্রবর্তী বাহিনী। চীনের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ দরিদ্র কৃষক এবং এই কৃষক শ্রেণীই হলো বিপ্লবের মূল শক্তি।"

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঐতিহাসিক লং মার্চ শুরু হয়। ২৫,০০০ লি দীর্ঘ এই অভিযান আপাতদৃষ্টিতে পশ্চাদপসরণ হলেও এই অভিযান বস্তুত ঐতিহাসিক বিজয় অভিযান ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যুদ্ধজয়ের ইতিহাসে পৃথিবীতে এমন কোন দ্বিতীয় নজির নেই। অসহনীয় ক্লেশ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ফিউকিয়েনের প্রান্ত থেকে শুরু করে তিব্বতের পূর্বাঞ্চল গোবি মরুভূমির সড়ক পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৮০০০ মাইল পথ তুষারাবৃত গিরিকন্দর, বরফে ঢাকা মালভূমি খরস্রোতা নদী অতিক্রম করে, কখন বা পায়ে হেঁটে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রণনীতি ও রণকৌশলের পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পাশাপাশি। একদিকে শত্রুসৈন্যকে পরাস্ত করার অদম্য আকাংক্ষা অন্যদিকে আত্মত্যাগের অঙ্গীকার, একদিকে চিয়াং কাই শেকের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জার্মানী, ফরাসী, জাপানী সেনাপতিসহ পাঁচ লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ অন্যদিকে তথাকথিত রণনীতির দিক থেকে অশিক্ষিত একলক্ষ শ্রমিক কৃষকের বাহিনী ৩৮১ দিনের পদযাত্রায় বারোটি প্রদেশের বিশ কোটি মানুষকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করল।

মাও-সে-তুঙ স্বয়ং বলেন– "লং মার্চের কথা উত্থাপন করে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, 'এর গুরুত্ব কি?' আমরা উত্তরে বলি যে ইতিহাসে এই ধরনের জিনিস এই প্রথম, লং মার্চ একটা ইশ্‌তাহার। লং মার্চ একটা বিপ্লবী প্রচার বাহিনী, বীজবোনার মন্ত্র।"

বিস্ময়ের কথা সর্বহারা বিপ্লবের এহেন সর্বাধিনায়কের কলম থেকে রচিত হয়েছে এমন কয়েকটি কবিতা যার সাহিত্য মূল্যের তুলনামেলা ভার। সারাজীবনব্যাপী অপরিসীম বিপ্লবী কর্মতৎপরতার মধ্যে এহেন কাব্য সৃষ্টি ইতিহাস পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। মাও সে-তুঙের কবিতা ও শিল্প সাহিত্য বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বকালের শ্রেষ্ট সাহিত্য ও পাঠক্রম। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৫৮ ও তৎপরবর্তীকালে মাও রচিত প্রতিটি কবিতা গণআন্দোলনের

ভিত্তিভূমির উপর দণ্ডায়মান। মানুষ, সংগ্রাম ও প্রকৃতি একে অন্যের অপরিহার্য পরিপূরকরূপে প্রাণ পেয়েছে। মাও-সে-তুঙের কবিতা 'lu' এবং 'tzu' এই দুই ফর্মে ছন্দবদ্ধ। 'lu' এবং 'tzu' চীনের কবিতা জগতে দুটি সুপ্রাচীন ছন্দ।

শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে মাও-সে-তুঙের বক্তব্য অতি স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। ইয়েনান ফোরামে শিল্প-সাহিত্যের উপর মাও প্রদত্ত ভাষণ শিল্প সাহিত্যের কর্মপন্থা নির্ধারণের ইতিহাসে এক নতুনদিগন্ত। মাও বলেনঃ "শত্রুকে পরাস্ত করবার জন্য আমরা অবশ্যই প্রাথমিকভাবে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর উপর আস্থা রাখি। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। ঐক্য সুদৃঢ় ও যুদ্ধে নিশ্চিত জয়লাভের জন্য সংস্কৃতি বিভাগের প্রয়োজন সৈন্যদের ও বিন্দুমাত্র কম নয় বরং বিশিষ্ট বলা চলে।"

এতদ্‌ব্যতীত মাও-সে -তুং বিভিন্ন সময়ে পার্টি কর্মীদের পঠনপাঠন ও তার গতিপ্রকৃতি এবং সংস্কৃতি বিভাগের শিল্পী সাহিত্যিকদের সাহিত্য ও শিল্প রচনার প্রকরণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"প্রশ্ন হলো কাদের জন্য আমরা শিল্প সাহিত্য রচনা করি। শ্রমিক কৃষক, সেনাবাহিনী, বিপ্লবীযোদ্ধা ও বিপুল ছাত্রসমাজ নিয়েই তো জনসাধারণ গঠিত।

জ্ঞানের অভাব বলতে আমরা কী বুঝি? জ্ঞানের অভাব বলতে বুঝি জনসাধারণকে না বোঝা। পূর্বসুরি লেখকবৃন্দ জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। তাঁরা শ্রমিক কৃষকের চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না। বস্তুত তাঁরা সর্বদা পরবাসে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন! তাঁরা সাধারণের পরিচিত উর্বর ভাষার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন না।...

"শিল্পী ও লেখকদের সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন। শিল্পী ও লেখকদের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও তার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা দরকার এবং সমাজে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে গতিশীল ভূমিকার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই শিল্পী ও সাহিত্যিকের কর্তব্য। এবং তাহলেই 'শতপুষ্প বিকশিত হোক" এই ধ্বনি যথাযোগ্য মর্যাদা লাভে সমর্থ হবে।"

২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সন্দীপ সেনগুপ্ত

কার্ল মার্কস

অস্থির অশেষ যাত্রা
এগিয়ে যেতে হবে দ্বন্দ্বে পথ ক'রে।
যা কিছু অনবদ্য, যা কিছু সুন্দর
আমার জীবনে আনব
ভেদ করব বিজ্ঞানের জগত
শিল্প ও সংগীতের রসে হব মুখর।

১
অন্তরে দুর্বহ বোঝা
অন্তর্দৃষ্টি কিন্তু স্বচ্ছ হল
অস্পষ্ট আমার বাসনা
অবশেষে মূর্ত হল তোমাতে।

জীবনের বন্ধুর কন্টকিত পথে
যা পারিনি আনতে হাতের মুঠোয়
তা এলো অযাচিত আমার কাছে
তোমার মদির দৃষ্টিতে।

২
মনের উদ্যমের মতো মহান শক্তিকে,
পৃথিবীর মতো যা অনন্ত
তাকে কী ক'রে রূপ দেবে শুধু শব্দ,
ধোঁয়ার মতো বংকিম রেখায় ভেসে-চলা এই শব্দ?

৩
হৃদয়কে যা জাপ্‌টে ধরে কঠিন শক্তিতে
ধীরে সুস্থে তার মোকাবিলা পারবনা কখনো,
অস্থির অশেষ যাত্রা
এগিয়ে যেতে হবে দ্বন্দ্বে পথ ক'রে।
যা কিছু অনবদ্য, যা কিছু সুন্দর
আমার জীবনে আনব
ভেদ করব বিজ্ঞানের জগত
শিল্প ও সংগীতের রসে হব মুখর।

৪
সাধ্য সীমার পরোয়া না ক'রে চল,
সংঘাত থেকে হটা কখনো নয়
ইচ্ছাশক্তি বর্জিত স্থবিরের মতো
বেঁচে থাকা কখনো নয়।

যন্ত্রণা আর খাটুনির জোয়ালে
শান্তভাবে কাঁধ গলানো? ধিক!
যা হবার হোক, আমাদের আছে
আশা, আকাংক্ষা, কর্ম ও প্রয়াস।

৫

কান্ট ও ফিক্‌টে চেয়েছেন ঘুরবেন ইথারে
দূরবর্তী কোন দেশের সন্ধানে
আর আমি চেয়েছি সম্পূর্ণ বুঝতে
আমি যা পেয়েছি রাজপথে।

৬

এপিগ্রামের জীবদের ক্ষমা কর
আমরা যদি অপছন্দের সুর ভাঁজি
আমরা আমাদের শিক্ষিত করেছি হেগেলে
আর তাঁর নন্দনতত্ত্ব থেকে নিজেদের এখনো
বিশুদ্ধ করতে পারি নি।

৭

হেগেল ঃ এপিগ্রাম

যেহেতু আমি চূড়ান্তকে আবিষ্কার করেছি,
চিন্তায় পেয়েছি গভীরতাকে
ঈশ্বরের মতোই আমি অ-মার্জিত,
আমি তারই মতো লুকাই অন্ধকারে
দীর্ঘকাল আমি খুঁজেছি,
আর চিন্তার উত্তাল সমুদ্রে ভেসেছি
এবং যখন আমি শব্দকে পেলাম,
যা পেয়েছি তাকেই আঁকড়ে আছি।

শব্দ শেখাই আমি দানবীর বিভ্রমে,
যে যা-খুশি ভেবে নিতে পারে তার মানে।
অন্তত সে আর কখনোই সীমার বন্ধনে হবে না আবদ্ধ,
কারণ যেমন এক প্রসারিত সানু হতে নেমে আসে
জলধারা ঘোর গরজনে,
কবি তার প্রেমিকার কথা আর ভাব করে রচনা,
দেখে যা সে ভাবে আর ভাবে যা সে অনুভব করে;
জ্ঞানের সরল সুধা সকলেই ক'রে নিতে পারে পান;
আসলে বলছি সবই তোমাদের কারণ কিছুই তো বলিনি।

৮
তার আরাম কেদারায় তৃপ্ত বোকা
জার্মান জনতা বসে আছে বাক্যহীন
যখন ঝড় দাপাচ্ছে উপরে ও চারপাশে
যখন আকাশ মেঘে ঘন আর অন্ধকার
যখন বিদ্যুৎ চমকায় আর হিসহিস করে চার পাশে
তখন জনতাকে চেতনায় উত্তেজিত করতে পারে না
কিন্তু যখন সূর্য বেরিয়ে আসে
যখন মৃদুমন্দ কথা বলে হাওয়া আর ঝড় থামে
তখন জনতা ওঠে আর আওয়াজ ছাড়ে
আর একটি গ্রন্থ লেখে ঃ 'বিপদ-সংকেত কেটে গেছে'।

৯.
আমি কী বাজাচ্ছি, মশায়! ঢেউ কী গর্জন করে
যখন তারা বজ্রনাদে ভাঙে পাহাড়ে
যখন নয়ন অন্ধ হয়, যখন বক্ষ লাফিয়ে ওঠে
যখন আত্মা গড়িয়ে যায় নরকের দিকে!

১০
চারণ, তুমি তোমার হৃদয় গুঁড়াও বিদ্রূপে
এবং জ্বলজ্বলে দেবতা যে শিল্প তোমাকে দিয়েছে
তুমি তাকে বহন করবে এবং শব্দের তরংগে তাকে ঝলমলাবে
যতক্ষণ না সে ফুলেফুলে উঠবে নক্ষত্রের নৃত্যে।

১১
ওটা কি? আমি বিদ্ধ করব লক্ষভ্রষ্ট না হয়ে আমার তরবারি
রক্তে কালো তোমার হৃদয়ে
আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, আমার চোখের
সামনে থেকে সরে যাও
তুমি কি চাও শিশুরা খেলবে তোমার ঘাড়ের চারপাশে?
ঈশ্বর শিল্প জানে না, ওদিকে নজর দেন না তিনি
নরকের ধোঁয়া থেকে যে-শিল্প মাথার ভেতরে জাগে
যতক্ষণ না মস্তিষ্ককে ঘাঁটানো হয়, যতক্ষণ না হৃদয় হয় রূপান্তরিত
আমি তা সরাসরি পেয়েছি এবং বাঁচাচ্ছি কৃষ্ণকায় লোকটি থেকে
যে আমার মুহূর্ত গোনে, যে আমার লেখা লেখে
মৃত্যুর পদযাত্রাকে বাজাবে উচ্চগ্রামে সুতীব্র ভাবে
বাজাবে অন্ধকার, বাজাবে আলোক
যতক্ষণ না হৃদয় ভাঙবে ধনুকে ও ছিলায়।

১২

সুতরাং আমরা সর্বদা সাহসী ভীষণ,
থামিনা কখনো, বিশ্রাম নেই কোন;
বেশি সাবধানী জড়তা কখনো নয়
যে প্রতিবাদ করেই নিঃশেষ হয়ে যাব,

আমরা কি মুরগির ওম দেবার মতো ধ্যানস্থ কবি তৈরি করবো
সংহতি স্বীকার করতে? –না তা কখনোই নয়
কারণ, চাহিদা ও কার্যক্রমের স্বরূপ বুঝতেই হবে
এরা আমাদের সঙ্গী চিরকাল।

১৩

আমার জন্য কোন সংকটমুক্ত জীবন নয়
নয় আমার উদ্বেলিত আত্মার জন্য
আমার হোক যুযুধান সমাকীর্ণ জীবন
শীর্ষ উঁচু কোন মহান উদ্দেশ্যের জন্য।

শিল্প! তোমার ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও
যে ঐশ্বর্যের লালন ও গুণগানে মানুষ আত্মহারা!
আমি আমার বোধবুদ্ধি অস্তিত্ব নিয়ে
সমস্ত পৃথিবীকে আলিংগন করবো।

চল যাই কোথাও সুদূর দিগঞ্চলে
ভ্রমণ হোকনা দীর্ঘ কঠিন কঠোর;
উদ্দেশ্যহীন নক্ষত্র-দিসারী
আমাদের জন্য কোন ধূসর অস্তিত্ব নয়।

আমাদের জন্য কোন সরীসৃপের জীবন নয় ক্ষয়িষ্ণু
দুঃসহ কোন জৈবিক খোঁয়াড়ে
আমাদের হৃদয় ও বোধ ক্রোধানলে উন্মোচিত হোক আকাংক্ষা
উন্মোচিত হোক আবেগ ও অহংকার–
প্রকৃত মানুষের ঔচিত্যের মতো।

এঙ্গেলস

তাঁর সংগীত হোল কোন সুগন্ধি অভিজাত বৃক্ষের ন্যায়
চিম্‌নির শীর্ষ থেকে
আত্মনিবেদিত অগ্নি, এই অগ্নিশিখায় তার সংগীত ও
সোনার বীণাযন্ত্র প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে–
এবং অত্যাচারীর রক্তাক্ত বিধ্বংসীকে দুন্দুভিনিনাদে ঘোষণা করে

১

জার্মান ভাষা

জার্মান ভাষা– সে তো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ঢেউএর মতো গর্জে ওঠে।
তীক্ষ্ণফলা প্রবারের ভিত্তিভূমির উপর এ ভাষা একটি সুদৃশ্য দ্বীপ
নির্মাণ করেছে,
হোমার আশ্রিত দীর্ঘ-তরংগ গর্জন এখানে সদাই প্রতিধ্বনিত হয়,
এবং বর্ষিত হয় এসকাইলাসের হাত থেকে বিদ্যুতের বৃহত্তম চাঙড়।
এ ভাষার দুর্ধর্ষ বনিয়াদ গড়েছে কীর্তিমানেরা
নলখাগড়ার বনে প্যানপাইপের বাজনা বাজে নুড়ির টুং টাং বোলে
পাহাড়ী নদী গান
এ ভাষায় রয়েছে সহস্র প্রকোষ্ঠের সিংহদ্বার
এবং এদেরই বেষ্টন করে শব্দিত বায়ুতরংগের উচ্ছ্বাস
এই হোল জার্মানিয়ার নিটোল জিহ্বা শাশ্বত,–
চিরবিস্ময়ী সঞ্চরমান।

–১৮৩৯

২

একটি সন্ধ্যা

বাগানে বসে আছি– পুরোনো দিনের সূর্য
এইমাত্র তলিয়ে গেল ঢেউএ, এবং সূর্যাস্তের রক্তিম ছটা,
সূর্যের রাজত্বকালে এরা গা ঢাকে
এখন জ্বলছে সোৎসাহে।
বিষণ্ন ফুলেরা উঠে এসে এ ওর বুকে মুখ লুকাল,
কেননা উৎফুল্ল রশ্মিমালা ছায়া ফেলেনি আর ওদের গালে
পাখিরা কিন্তু নাগাল না পাওয়া শাখায় বসে
নির্জনতার গান গাইছে সুখে।
যে সব জাহাজ সাগর দেয়নি পাড়ি
নদীর পিঠে বিশ্রাম নিচ্ছে তারা
দূর থেকে শোনা যায় সেতুগুলির কাঠের শব্দ
ক্লান্ত পথিকেরা সাঁকো পেরিয়ে ঘরে ফিরছে।

–১৮৪০

৩

এবং আমিও এক মুক্ত চারণ কবি
'বোর্নে'–রূপী সুদৃশ ওক শাখায় আরোহণ করেছি ভাল,
অথচ সমস্ত উপত্যকায় তখন অত্যাচারী শোষকের
নাগপাশে পিষ্ট জার্মানির চতুর্দিক;

হ্যাঁ, আমি ঐ সাহসী বিহগের একজনা
যে নাকি স্বাধীনতার স্বর্গীয় সাগরে নৌকায় পাল তোলে
আমি বরং ওদের মধ্যে একটি চড়ুই পাখি হব
হবনা কোকিল– যাকে পিঞ্জরাবদ্ধ থেকে বাধিত হতে হয়
এবং গান গেয়ে গেয়ে ঘুম পাড়াতে হয় কোন রাজপুত্রকে।

৪
এবং তারপর আসবে একজন নতুন কেলডারন
কবিতার সমুদ্রে অন্বেষণরত একটি উজ্জ্বল জহরৎ
তাঁর সংগীত হোল কোন সুগন্ধি অভিজাত বৃক্ষের ন্যায়
চিম্‌নির শীর্ষ থেকে
আত্মনিবেদিত অগ্নি, এই অগ্নিশিখায় তার সংগীত ও
সোনার বীণাযন্ত্র প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে–
এবং অত্যাচারীর রক্তাক্ত বিধ্বংসীকে দুন্দুভিনিনাদে ঘোষণা করে

৫
[বার্লিন ত্যাগের পূর্বপর্যন্ত মার্কস Doktar Klub-এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে এই Doctor Klubকে পরিপুষ্ট করতেন। মার্কস এই সংসদের কত প্রিয়পাত্র ছিলেন তা এঙ্গেলস রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটির রচনাকালে এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কসের কোন চাক্ষুষ যোগাযোগ ঘটেনি। ১৮৪১-৪২ সাল। তরুণ এঙ্গেলস তখন জার্মান গোলন্দাজ রক্ষীবাহিনীর একজন সদস্য।]

কে এত দ্রুত আসে– যেন চড়েছে শকটে?
ট্রিয়ের থেকে কালো মানুষের প্রেমিক,– এক দানব।
সে কেবল হেঁটেই ক্ষান্ত নয়, গোড়ালি উঁচিয়ে
সামনে লাফিয়ে চলে
সে একাই ভেঙেছে বাঁধ, ক্রোধের অগ্নিজ্বালে
তাঁর প্রজ্ঞাভরা উত্তোলিত হাত আকাশের দিকে সোচ্চারে উদ্ধত
যেন আকাশকে টেনে নামিয়ে আনতে চায় মাটিতে।
তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতে শক্তির দ্যোতনা– সচকিত আহ্বান,
যেন কালসাপ ফুঁসে ওঠে পেছনে।

[কবিতাটি পাওয়া গেছেঃ Karl Marx–A Biography by the Institute of Marxism Leninism of the Central Committee of the Socialist Unity Party of Germany, Berlin 1968.]

লেনিন

আগুনের ফলকে, অনির্বাণ এক পলকে
তারা আমাদের সামনে এঁকে দিয়ে গেছে আত্মোৎসর্গের পথ,
জীবনের সনদে, তারা ঘৃণার শীলমোহর লাগিয়ে গিয়েছে
দাসত্বের জোয়ারের উপর, শৃংখলের লজ্জার উপর।

সে এক ঝড়ো বছর। ঝঞ্ঝা ছেয়ে ফেলল
সারা দেশ। ছিন্নভিন্ন হল মেঘ,
ঝড় ভেঙে পড়ল আমাদের উপর,
তারপর শিলাবর্ষণ আর বজ্রপাত।
ক্ষতগুলি হাঁ হয়ে রইল ক্ষেতে আর গ্রামে আঘাতের পর আঘাতে।
ঝলকাতে লাগল বিদ্যুৎ, হিংস্র উন্মত্ত হয়ে উঠল সেই ঝলকানি।
উত্তাপ জ্বলতে লাগল নির্মম, বুকের উপর চাপল পাষাণভার।
এবং আগুনের আভা আলোকিত ক'রে তুলল
নক্ষত্রহীন রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকার।

সারা সৃষ্টি সমস্ত মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে গেল
এক থমথমে উদ্বেগে পীড়িত হতে থাকল সমস্ত হৃদয়
বুকগুলি যন্ত্রণায় হাঁসফাঁস করতে লাগল
বন্ধ হয়ে গেল শুকনো সব মুখ
রক্তাক্ত ঝড়ে হাজার হাজার শহীদ হারাল প্রাণ
কিন্তু বৃথাই দুঃখ সয়নি তারা, বৃথাই পরেনি কাঁটার মুকুট।
মিথ্যার আর অন্ধকারের রাজ্যে ভণ্ড দাসদের মধ্যে
তারা এগিয়ে গেল ভবিষ্যতের মশালের মতো।

আগুনের ফলকে, অনির্বাণ এক পলকে
তারা আমাদের সামনে এঁকে দিয়ে গেছে আত্মোৎসর্গের পথ,
জীবনের সনদে, তারা ঘৃণার শীলমোহর লাগিয়ে গিয়েছে
দাসত্বের জোয়ারের উপর, শৃংখলের লজ্জার উপর।

নিশ্বাস পড়ল হিমের। পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে ঝরল
হাওয়ায় আটকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল এক মরণ-নাচ
এল হেমন্ত, ধূসর গলিত হেমন্ত।
বৃষ্টির কান্নায় ভরা, কালো কাদায় ডোবা।
মানুষদের কাছে জীবন হল ঘৃণ্য, নিরানন্দ
দুই-ই সমান অসহ্য তাদের কাছে– জীবন আর মৃত্যু।
ক্রোধ আর যন্ত্রণা অবিরাম কুরে কুরে খেতে লাগল তাদের।
তাদের হৃদয় হল তাদের গৃহেরই মতো
হিম আর শূন্য আর বিষণ্ন।
তারপর হঠাৎ, বসন্ত! বসন্ত একেবারে পচা হেমন্তের মাঝখানে

আমাদের উপর নেমে এল উজ্জ্বল সুন্দর বসন্ত,
ম্রিয়মাণ দুর্গত দেশে স্বর্গের উপহারের মতো,
জীবনের অগ্রদূতের মতো, সেই লাল বসন্ত!
মে মাসের সকালের মতো এক রক্তির প্রত্যুষ
উঠল পাণ্ডুর বিষণ্ন আকাশে
ঝকঝকে লাল সূর্য তার রশ্মির তলোয়ারে
ফেড়ে ফেলল মেঘ, ছিঁড়ে গেল কুয়াশার শবাচ্ছাদন।
পৃথিবীর সমুদ্রগহ্বরে বাতিঘরের দীপ্তির মতো,
প্রকৃতির বেদীমূলে কোন অজানা হাতে জ্বালানো শাশ্বত
হোমাগ্নির মতো
নিদ্রিত মানুষকে সে আকর্ষণ করল আলোকের দিকে।

উদ্দীপ্ত রক্ত থেকে জন্ম নিল রাঙা গোলাপ, লাল লাল ফুল,
তারা ফুটে উঠল
আর বিস্মৃতির কবরগুলোর উপর পরিয়ে দিল
গৌরব-মুকুট।
মুক্তির রথের পিছনে
লাল নিশান উড়িয়ে
নদীর মতো প্রবাহিত হল জনতা
যেমন করে বসন্তে জেগে ওঠে জলস্রোত।
লাল পতাকা স্পন্দিত হল শোভাযাত্রার উপর,
মুক্তির পবিত্র স্তোত্র উঠল আকাশে,
প্রেমের অশ্রু চোখে জনগণ শহীদদের স্মরণে
গান গাইতে লাগল শোকযাত্রার গান।
জনগণ আনন্দে উচ্ছল,
তাদের হৃদয় ছাপিয়ে গেল আশায় আর স্বপ্নে,
সবাই বিশ্বাস করল আগত মুক্তিতে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ থেকে কিশোর পর্যন্ত সবাই।
কিন্তু নিদ্রার পরই আসে জাগরণ,
বাস্তব নিষ্করুণ,
স্বপ্ন আর মদিরতার স্বর্গসুখের পরেই আসে
প্রবঞ্চনার তিক্ত স্বাদ।
অন্ধকারে শক্তিরা ছায়ায় গুঁড়ি মেরে ছিল,
ধুলোর মধ্যে বুকে হেঁটে ফোঁস ফোঁস করছিলঃ
ওৎ পেতে ছিল তারা।

হঠাৎ তারা তাদের দাঁত আর ছুরি বসিয়ে দিল
বীরদের পিঠে আর পায়ে।
জনগণের শত্রুতা নোংরা মুখ দিয়ে
পান ক'রে নিল উষ্ণ নির্মল রক্ত,
মুক্তির অসংশয়ী বন্ধুরা তখন কঠিন পথশ্রমে অবসন্ন,
যে সময় তারা তন্দ্রাতুর আর নিরস্ত্র তখন অতর্কিতে
আক্রান্ত হল তারা।

আলোর দিন অদৃশ্য হল,
তার জায়গায় জুড়ল অভিশপ্ত সীমাহীন কালো দিনের সারি।
মুক্তির আলো আর সূর্য নিভে গেল,
অন্ধকারে উদ্যত হয়ে রইল এক সর্পদৃষ্টি।
জঘন্য হত্যাকাণ্ড, সাম্প্রদায়িক হিংসা কুৎসার উৎক্ষেপ
ঘোষিত হচ্ছে দেশপ্রেম বলে,
অন্ধকারের বাহিনী উৎসব করছে
অকুণ্ঠ হৃদয়হীনতায়,
যারা প্রতিহিংসার বলি হয়েছে
যারা বিনা কারণে বিনা দয়ায়
বিশ্বাসঘাতী আক্রমণে নিহত হয়েছে
তাদের সেই সব জ্ঞাত অজ্ঞাত শিকারের রক্তে ওরা লিপ্ত।

মদের বাষ্পের মধ্যে খিস্তি করতে করতে মুঠো বাগিয়ে
হাতে ভদ্‌কার বোতল নিয়ে ইতরের দল
দৌড়ুচ্ছে যেন পশুর পাল
আর তাদের পকেটে বাজছে বিশ্বাসঘাতকতার টাকা,
তারা নাচছে ডাকাতের নাচ।
কিন্তু ইয়েমলিয়া ঐ গোবর[১] গণেশটা
বোমার ভয় পেয়ে আরো বোকা ব'নে ইঁদুরের মতো কাঁপে
তারপর অসংকোচে জামায় আঁটে
"কালো শত"[২] দলের চিহ্ন।
মুক্তি আর আনন্দের মৃত্যু ঘোষণা ক'রে,
পেঁচাদের গোমড়া হাসি
রাতের অন্ধকারে প্রতিধ্বনি তোলে

---

[১] রুশরা ইয়েমলিয়া নামটা ব্যবহার করে বোকামির প্রতীক হিসাবে
[২] জারের আমলে চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল

চিরন্তন বরফের রাজ্য থেকে
এক নিষ্ঠুর শীত এল তুষার ঝড় নিয়ে
শাদা শবাচ্ছদনের মতো পুরু তুষার দিয়ে
ঢাকল বিরাট দেশ।
বরফের শিকলে বেঁধে বসন্তকে অকালে মারল
শীত-জল্লাদ।

কাদার ছোপের মতো এখানে ওখানে দেখা যায়
তুষারের কবরে শোচনীয় গ্রামগুলির
ছোট ছোট কালো কুটীরচূড়া,
দুর্দশা আর পাণ্ডুর শীতের সঙ্গে ক্ষুধা
গেড়ে বসেছে সর্বত্র সমস্ত দূষিত গৃহে।
গ্রীষ্মে যেখানে জ্বলন্ত বাতাস আগ্নে উত্তাপ বয়ে আনে–
অন্তহীন তুষারের প্রান্তর জুড়ে
সীমাহীন পরিমাপহীন স্টেপ জুড়ে–
তুষারের হিংস্র দমক আসা যাওয়া করে গৃধ্নু শাদা পাখিদের মতো।
বাঁধনছেঁড়া সেইসব দমক গর্জন করে, সোঁ সোঁ করে,
তাদের বিরাট হাত অসংখ্য মুঠিতে অবিরাম ছোঁড়ে তুষার
তারা গায় মৃত্যুর স্তোত্র
যেমন তারা গেয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।
ঝড় গর্জন করে বন্য লোমশ এক জন্তুর মতো,
বিন্দুমাত্র জীবনযাপন যার মধ্যে আছে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,
আর পৃথিবী থেকে জীবনের সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে
পাখাওয়ালা এক ভয়ংকর সাপের মতো ঝটপট করতে করতে ওড়ে।
ঝড় গাছগুলিকে নুইয়ে দেয়, তছনছ করে বন,
পর্বতপ্রমাণ তুষারের স্তূপ সাজায়।
পশুরা পালিয়েছে তাদের গুহায়,
পথ-রেখা অদৃশ্য, পথিক নিশ্চিহ্ন।
অস্থিসার বুভুক্ষ নেকড়েরা ছুটে আসে,
ঘুরে বেড়ায় ঝড়ের পায়ে পায়ে,
শিকার নিয়ে উন্মত্ত কাড়াকাড়ি,
আর চাঁদের দিকে মুখ উঁচিয়ে চিৎকার,
যা কিছু জীবিত সব ভয়ে কাঁপে।
পেঁচা হাসে, বুনো লেশি[১] হাততালি দেয়।

---

[১] রুশ গল্পে বলা বনের অপদেবতা

মাতাল হয়ে কালো দৈত্যেরা ঘূর্ণিতে ঘোরে
আর তাদের লুব্ধ ঠোঁটে আওয়াজ করেঃ
ওরা মারণ-যজ্ঞের গন্ধ পেয়েছে,
রক্তাক্ত সংকেতের প্রতীক্ষা করে ওরা।
সব কিছুর উপর বরফ; সর্বত্র মৃত্যু; সমস্ত চরাচর হিমে জমাট।
সকল জীবন যেন নিশ্চিহ্ন,
সারা পৃথিবী যেন একটা কবরের গহ্বর।
মুক্ত আলোকিত জীবনের আর কোন চিহ্ন নেই,
তবু রাত্রির কাছে দিনের পরাজয় হয়নি এখনও,
এখনও জীবনকে পর্যদুস্ত ক'রে কবরের জয়োৎসব নয়,
এখনও ভস্মের মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছে স্ফুলিংগ;
জীবন তার নিশ্বাসে তাকে আবার জাগাবে।

ছিন্ন পদদলিত মুক্তির ফুল
বিনষ্ট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে একেবারে,
"কালোরা"[২] আলোর পৃথিবীর সন্ত্রাসে উল্লষিত,
কিন্তু ঐ ফুলের ফল জন্মদাত্রী মাটির ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে।
মায়ের জঠরে আশ্চর্য সেই বীজ
দৃষ্টির অন্তরালে গভীর রহস্যে নিজেকে জীইয়ে রেখেছে;
মাটি তাকে পুষ্ট করবে, সে উত্তাপ পাবে মাটির ভিতরে,
তারপর নতুন এক জীবনে আবার জন্মাবে সে।
নতুন মুক্তির উন্মুক্ত বীজাণু সে বহন করবে,
ভেঙে ফেলবে বরফের আস্তরণ,
বেড়ে উঠবে, বিশাল মহীরুহ হয়ে জগৎকে
            আলোকিত করবে তার লাল পত্রবিস্তারে
সারা জগৎকে, আর তার ছায়ার তলে জড়ো করবে
            সমস্ত জাতির জনগণকে।

অস্ত্র ধরো, ভাইরা! সুখের দিন কাছে!
সাহসে বুক বাঁধো! ঝাঁপিয়ে পড়ো যুদ্ধে এগিয়ে চলো!
তোমাদের মনকে জাগাও! তোমাদের হৃদয় থেকে
            হীন ভীরু ভয়কে তাড়াও!
দৃঢ় করো ব্যূহ! স্বৈরাচারীদের আর প্রভুদের বিরুদ্ধে

---

[২] সব জায়গায় 'কালো শত' না ব'লে শুধু 'কালো' দ্বারাই লেনিন ঐ দলটিকে বুঝিয়েছেন।

সবাই এক সঙ্গে দাঁড়াও!
বিজয়ভাগ্য তোমাদের সবল শ্রমিক-বাহুর মুঠিতে!
সাহসে বুক বাঁধো! এই দুর্দিন শিগগিরই দূর হবে!
এক হয়ে তোমরা দাঁড়াও মুক্তি-পীড়কদের বিরুদ্ধে!
বসন্ত আসবে...আসছে সে...এসে গেছে সে।
আমাদের বহু আকাংক্ষিত অপূর্ব সুন্দর সেই লাল মুক্তি
এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে!
স্বৈরশাসন, জাতীয়তাবাদ, গোঁড়ামি,
অকাট্য ভাবে প্রমাণ করেছে তারা কত গুণের আধার;
তাদেরই নামে ওরা আমাদের মেরেছে, মেরেছে, মেরেছে,
ওরা কৃষককে আঘাত করেছে তার অস্থিমজ্জায়,
ওরা ভেঙে দিয়েছে দাঁত,
ওরা শৃংখলিত মানুষকে কবর দিয়েছে বন্দীশালায়,
ওরা লুট করেছে, ওরা খুন করেছে...
আমাদের মংগলের জন্য, আইন মাফিক,
জারের গৌরবের জন্যে, সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্যে!
জারের গোলামরা তার জল্লাদদের পরিতৃপ্ত করেছে,
তার সৈন্যরা তার গৃধ্ন শকুনদের ভোজ দিয়েছে
রাষ্ট্রের মদ দিয়ে আর জনগণের রক্ত দিয়ে।
তার ঘাতকদের ওরা পরিতৃপ্ত করেছে,
তার গৃধ্ন শকুনদের পরিপুষ্ট করেছে
বিদ্রোহী আর বিনীত বিশ্বস্ত দাসদের শব দিয়ে।
খ্রীস্টের সেবকেরা ঐকান্তিক প্রার্থনা সহ
পবিত্র জল সিঞ্চণ করেছে ফাঁসিকাঠের অরণ্যে।
শাবাশ! আমাদের জারের জয় হোক!
জয় হোক তার আশীর্বাদপূত ফাঁসুড়ে দড়ির
জয় হোক তার চাবুক তলোয়ার বন্দুকধারী পুলিসপুংগবদের!

হে সৈন্যরা, এক গ্লাস ভদ্‌কার মধ্যে
ডুবিয়ে দাও তোমাদের অনুশোচনা!
হে বীরবৃন্দ, চালাও গুলি শিশু আর নারীর উপর!
তোমাদের ভাইদের হত্যা করো যত বেশি পারো
যাতে তোমাদের ধর্মবাপ কুশি হতে পারেন!
আর যদি তোমাদের আপন বাপ গুলি খেয়ে পড়ে
তবে ডুবে যাক সে তার নিজের রক্তে

'কেন'– এর হাতে ঝরানো রক্তে!
জারের মদ খেয়ে পশু ব'নে
তোমার নিজের মাকে বিনা দ্বিধায় মারো।

কি ভয় তোমার!
তোমার সামনে যারা রয়েছে তারা তো জাপানী নয়।
তারা নিছক তোমার প্রতিবেশী, তোমার পরিচিত!
এবং তারা একেবারেই নিরস্ত্র!
হে জারের ভৃত্যেরা, তোমাদের হুকুম দেওয়া হয়েছে।
কথা বোলোনা তোমরা! ফাঁসি দাও,
গলা কাটো, গুলি করো, তোমাদের ঘোড়ার খুরে দলে দাও!
তোমাদের অপকীর্তির পুরস্কার পাবে তোমরা পদক আর ক্রশ
কিন্তু যুগ যুগ ধরে অভিসম্পাদ বর্ষিত
তোমাদের উপর হে জুডাসের দল!
হে জনগণ, তোমাদের শেষ জামাটি দিয়ে দাও,
শিগ্‌গির, শিগ্‌গির! খুলে দাও জামাটা।
তোমাদের শেষ কড়িটি খরচ করে মদ খাও,
জারের গৌরবের জন্যে মাটিতে পড়ে পিষে ম'রে যাও!
আগের মতো ভারবাহী পশু হয়ে যাও! চিরকালের দাসেরা;
কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মোছো
আর মাটিতে তোমাদের মাথা কাটো!
বিশ্বস্ত সুখী
আমরণ জারের প্রাণপ্রিয়, হে জনগণ,
সবই সয়ে যাও, সবই মেনে চলো আগের মতো...
গুলি! চাবুক...আঘাত করো...

হে ঈশ্বর, রক্ষা কর জনগণকে,[১]
শক্তিমান, মহিমময় জনগণকে!
রাজত্ব করুক আমাদের জনগণ, ভয়ে ঘেমে উঠুক জারেরা!
তার জঘন্য দলকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের জার আজ উন্মত্ত,
তার ঘৃণ্য গোলামের দল আজ উৎসবরত
তাদের রক্তমাখা হাত তারা ধুয়েও নেয়নি!

---

[১] জারীয় সাম্রাজ্য-সংগীতের ছত্রে 'হে ঈশ্বর, রক্ষা কর জারকে' কথাটি লেনিন এইভাবে ব্যবহার করেছেন।

হে ঈশ্বর, রক্ষা কর জনগণকে
এই অন্ধকার দিনে!
আর তোমরা, জনগণ, তোমরা রক্ষা কর লাল নিশানকে!
সীমাহীন অত্যাচার! পুলিসের চাবুক!
আদালতের আচম্‌কা সাজা
মেশিনগানের গুলির ঝাঁকের মতো!
শাস্তি আর গুলি বর্ষণ,
ফাঁসিকাঠের ভয়ংকর অরণ্য,
তোমাদের বিদ্রোহের সাজা দেওয়ার জন্যে!
জেলখানাগুলো ভরে উঠেছে,
নির্বাসিতেরা অন্তহীন যন্ত্রণায় জর্জর,
গুলির ঝাঁক রাত্রিকে ছিঁড়ে ফেলছে।
খেয়ে খেয়ে শকুনের অরুচি ধ'রে গেছে।
বেদনা আর শোক মাতৃভূমির উপর ছড়িয়ে পড়েছে
দুঃখে নিমজ্জিত নয় এমন একটি পরিবারও নেই।
তোমার জল্লালদের দিয়ে,
হে স্বৈরাচারী, চালাও, তোমার রক্তাক্ত ভোজের উৎসব,
হে রক্তশোষক, তোমার লুব্ধ কুকুরদের দিয়ে
ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাও জনগণের মাংস!
হে স্বৈরাচারী, আগুন বুনে দাও!
আমাদের রক্ত পান কর, রাক্ষস!
মুক্তি, তুমি জাগো!
ওড়ো তুমি, লাল নিশান!
আর তোমরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করো, সাজা দাও,
শেষবারের মতো আমাদের পীড়ন করো!
শাস্তি পাওয়ার সময় নিকটে,
বিচার আসছে, জেনে রাখো!
মুক্তির জন্যে, আমরা যাব মৃত্যুর মুখে, মৃত্যুর মুখে
আমরা ছিনিয়ে নেব ক্ষমতা আর মুক্তি,
পৃথিবী হবে জনগণের!

অসমান সংগ্রামে প্রাণ হারাবে অসংখ্য লোক!
তবু চলো আমরা এগিয়ে যাই
বহু-বাঞ্ছিত মুক্তির দিকে!

হে শ্রমিক! এগিয়ে চলো!
তোমার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে চলেছে
স্বাধীন শ্রমের জন্যে।
তাদের দৃষ্টি জ্বলছে ভয়াল।

আকাশ কাঁপিয়ে বাজাও শ্রমের মৃত্যুঞ্জয়ী ঘণ্টা!
আঘাত করো, হাতুড়ি, আঘাত করো অবিরাম!
অন্ন! অন্ন! অন্ন!

এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, কৃষকেরা!
জমি ছাড়া তোমরা বাঁচতে পারো না।
প্রভুরা কি তোমাদের শোষণ করবে এখনও,
তারা কি তোমাদের পীড়ন করবে এখনও অনেককাল?
এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, ছাত্রেরা!
তোমাদের অনেকে ধ্বংস হবে সংগ্রামে।
লাল ফিতে জড়িয়ে রাখবে
নিহতদের শবাধার!

এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, ক্ষুধিতেরা।
এগিয়ে চলো, নিপীড়িতেরা!
এগিয়ে চলো, অপমানিতেরা, মুক্ত জীবনের দিকে!
জন্তুদের শাসনের জোয়াল
আমাদের লজ্জা।
চলো, ইঁদুরগুলোকে তাড়াই তাদের গর্ত থেকে!
চলো যুদ্ধে, হে সর্বহারা!

নিপাত যাক দুঃখ-দুর্গতি!
নিপাত যাক জার আর তার সিংহাসন!
নক্ষত্রখচিত মুক্তির প্রত্যূষ
ঐ দেখ তার দীপ্তি ছড়ায়
সুখ আর সত্যের রশ্মি
জনগণের চোখের সামনে ফুটে ওঠে।
মুক্তির সূর্য মেঘ ভেদ করে আলোকিত করবে আমাদের।

আর পাগলা ঘন্টির জোরালো স্বর
মুক্তিকে আবাহ্ন ক'রবে
জারের বদমাশদের হেঁকে বলবে
হাত নামাও, ভাগো তোমরা।

আমরা জেলখানার চোরাকুঠুরি চূর্ণ করব।
সমুচিত ক্রোধ গর্জন করে।
মুক্তির পতাকা
আমাদের যোদ্ধাদের পরিচালিত করে।
নিপীড়ন, ওখরানা,[১]
চাকু, ফাঁসিকাঠ, নিপাত যাক!
মুক্ত মানুষের সংগ্রাম, তুমি আগল ভেঙে বেরোও!
অত্যাচারীরা, ধ্বংস হও!
এসো নির্মূল করি স্বৈরাচারের ক্ষমতাকে।
মুক্তির জন্য মৃত্যু হল সম্মান,
শৃংখলিত জীবন ধারণ হল লজ্জা।

এসো ভেঙে ফেলি দাসত্ব,
গোলামির লজ্জা ভেঙে ফেলি।
হে মুক্তি, আমাদের দাও
পৃথিবী আর স্বাধীনতা!

---

[১] বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্যে গঠিত জারের রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগকে বলা হত ওখরানা।

স্তালিন

আমি আমার জামা খুলে ফেলে
বুকখানা চাঁদের দিকে মেলে দেব
তারপর প্রসারিত করাঙ্গুলিতে শ্রদ্ধা জানাব তাকেই
যে পৃথিবীর বুকে শুধু আলো বর্ষণ করে।

প্রভাত

গোলাপটি মেলে ধরেছে তার পাপড়িগুচ্ছ
বুকে নিয়েছে প্রথম সূর্যের আলো
লিলি ফুলেরও ভেঙেছে ঘুম
ফুরফুরে স্নিগ্ধ হাওয়ায় ওরা দুলছে।

লার্ক পাখিগুলি দূর আকাশে ওড়ে
কণ্ঠে রয়েছে তীক্ষ্ণ মদির গান
ঘুঘু পাখিটিও তার সুরেলা কণ্ঠ নিয়ে
গেয়ে চলেছে স্নিগ্ধ মধুর গানঃ

ওগো আমার পূজিত মাতৃভূমি, তুমি উর্বরতা লাভ কর;
ওগো আমার ইভেরিয়ার মাটি, তুমি আনন্দিত হও
এবং তোমরাও– ওগো আমার জর্জিয়াবাসী শিক্ষিত মানুষের দল
তোমাদের কল্যাণে দেশে সুখ ও শান্তি আসুক।

প্রকাশকাল: জানুয়ারি ১৪, ১৮৯৫

চাঁদের প্রতি

ক্লান্তিহীনের প্রতীক, তুমি এগিয়ে চল,
সর্বশক্তিমানের মহান ইচ্ছাকে বুকে নিয়ে
তুমি কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘরাশিকে হটিয়ে দাও,
এবং মাথা নত কোরোনা কখনো কোরোনা।

পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তুমি যে স্নিগ্ধ হাসি হাস
সে হাসি নিয়ত ছড়িয়ে থাকে মাটির পৃথিবীতে;
এবং যে পাহাড় মনে হয় আকাশ থেকে নেমে এসেছে
সেই মখিনভারি পাহাড়ের কোলে বসে তুমি ঘুমপাড়ানি
গান গাও।

তুমি তো ভালই জান যারা একবার
অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে হয়েছে পিষ্ট
তারা জেগে উঠবেই এবং আশার ডানায় ভর করে
তারা ঐ পবিত্র পর্বতমালাকে অতিক্রম করে উঁচুতে মাথা তুলবে।

এবং বিগতদিনের মতো
হে সুন্দর, তুমি মেঘ ছিঁড়ে আলো প্রদান কর
সুতরাং হে নূতন, তোমার উজ্জ্বল রশ্মিরাজি
সমস্ত নীলাকাশে ক্রীড়ায় মেতে উঠুক।

আমি আমার জামা খুলে ফেলে
বুকখানা চাঁদের দিকে মেলে দেব
তারপর প্রসারিত করাঙ্গুলিতে শ্রদ্ধা জানাব তাকেই
যে পৃথিবীর বুকে শুধু আলো বর্ষণ করে।

প্রকাশকাল: অক্টোবর ১১, ১৮৯৫

আর ইরিস্টাভির উদ্দেশে

[কবিতাটি ১৮৯৫ সালের ২৯শে অক্টোবর বিখ্যাত জর্জিয়ান কবি রাপিয়েল ইরিস্‌টাভির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ইভেরিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইরিস্টাভির বিখ্যাত কবিতার নাম– "A Suppliant to a Judge." বা "মহামান্য বিচারকের প্রতি নিবেদন।" এই কবিতাটিতে জনৈক কৃষকের অপমান ও দুঃখ-দুর্দশার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষকটি অনেকেরই মতো ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে যোগদান করে এবং তাকে গ্রেফতার করে আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয়। জর্জিয়ার মহৎ বিদগ্ধদের অনেকেই এই বিদ্রোহী কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেন। কবি ইরিস্‌টাভিও এই বিদগ্ধদের একজন যিনি কবিতার পর কবিতা রচনা করে কৃষকদের অবস্থা ও বক্তব্য বিশদভাবে তুলে ধরে। ইরিস্‌টাভির কবিতায় যে সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে তা হল বিষণ্ণতা। অশ্রু বর্ষণের মধ্য দিয়েই তিনি জারীয় আমলাতন্ত্র ও তার সৈন্যসামন্তদের নিপাত ঘোষণা করেছে। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কৃষকদের দুঃখপরিতাপের বিলাপধ্বনি। জর্জিয়ার প্রতিটি লোক এই কবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং স্তালিনের এই কবিতাটি কবি ইরিস্টাভির প্রতি আবেগ মথিত শ্রদ্ধা নিবেদন।]

কৃষকদের দুঃখ বিলাপ শ্রবণে
তোমার চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে
এবং দুঃখকে নিবেদন করতে চাও স্বর্গভূমির দিকে
কেননা তুমি দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত।

যখন খবর আসে মানুষ সুখে আছে
তুমি উদ্বেল হয়ে ওঠ আনন্দে
এবং সুখে বীণা বাজাও
যেন দেবলোক থেকে ভেসে আসে সংগীতের মূর্ছনা।

যখন মাতৃভূমির স্মরণে গাও গান
ব্যক্ত হয় এক আবেগপূর্ণ আকাংক্ষা
এবং বীণার ঝংকারে
তোমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সংগীতের স্বতোৎসার।

সুতরাং হে কবি জর্জিয়াবাসী আজ
তোমার জন্য নির্মাণ করেছে এক স্বর্গীয় স্মৃতিস্তম্ভ।
এবং বিগত দিনের দুঃখকষ্টের বোঝা
আজ পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছে।

প্রকাশকাল: অক্টোবর ২৯, ১৮৯৫

হো চি মিন

দেহ কারাগারে বন্দী,
বাইরে উধাও মনঃ
মহৎ ভাবনাকে রূপ দিতে যদি চাও
মনকে উদার কর আর কর ইস্‌পাত কঠিন।

১.

দেহ কারাগারে বন্দী,
বাইরে উধাও মনঃ
মহৎ ভাবনাকে রূপ দিতে যদি চাও
মনকে উদার কর আর কর ইস্‌পাত কঠিন।

২.

ডায়েরির প্রথম পৃষ্ঠা

কবিতা পড়া স্বভাব নয়কো মোটে
কিন্তু জেলের মধ্যে কী-ই বা করার আছে?
এ ক'টা দিন ভিড়াব তরী কবিতা লেখার হাটে
গান গেয়ে গেয়ে আগুয়ান হব মুক্তিদূতের কাছে।

৩.

টুকভিন সড়কে গ্রেফ্‌তার

('সমৃদ্ধি ও গৌরব' সড়ক)
'সমৃদ্ধি ও গৌরব' সড়কে লজ্জায় বিমূঢ় আমি
কেননা যাত্রায় বিলম্ব ঘটে গেছে
আমি তো একজন স্বচ্ছ ধ্যান ধারণার অংশীদার সৎলোক
অথচ প্রমাণহীন গুপ্তচর অভিযোগে বন্দী।

৪.

সিং সি সদর জেলে আগমন

পুরোনো বাসিন্দারা নবাগতকে স্বাগত জানায় জেলে।
দূর আকাশে শাদা মেঘের দল কালো পেছনে ধায়।
শাদা ও কালো মেঘের রাশি চোখের আড়ালে উড়ে চলেছে
পৃথিবীতে মুক্ত মানুষেরা জেলে কিলবিল করে।

৫.

জীবনের পথ বন্ধুর

১.

বন্ধুর পর্বতমালা ও সুউচ্চশৃংগ অতিক্রম করে
সমতলে অধিক বিপদ ঘনাবে কি করে ভাবি?
পাহাড়ে বাঘের মুখে পড়েও অক্ষত ফিরে এসেছিঃ
এখানে মানুষের মুখোমুখি হয়ে জেলে নিক্ষিপ্ত।

২.

আমি ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি
চীনের পথে চলেছি মূল্যবান ব্যক্তিত্বের সংগে পরিচয় হবে
এই আশায়
শান্ত যাত্রাপথে ঝড় উঠেছে
জামাই আদরে আমাকে জেলে ঠেলল।

৩.

আমি একজন অপাপবিদ্ধ সোজাপথের মানুষ,
তবু চীনের গুপ্তচর এই অভিযোগ থেকে যায়
কাজেই দেখ, জীবন কোন সরল ব্যাপারই নয়,
এবং এখন তো চারদিক অসুবিধার তমিস্রায় আবৃত।

৬.

প্রভাত

১.

প্রতিদিন দেওয়াল ফুঁড়ে সূর্য ওঠে পুবে
গেটে তালা, রশ্মিমালা আছ্ড়ে পড়ে গরাদে
জেলের মধ্যে ভুবন জোড়া অন্ধকার
কিন্তু আমরা জানি বহির্বিশ্ব সূর্যালোকে উদ্ভাসিত।

২.

ঘুম ভেঙে প্রথম কাজ টেনেটেনে শরীর থেকে জোঁকছাড়ান।
সকালে খাবার ঘণ্টা বাজে আটটায়,
চলো হে পেটপুরে খেয়ে তো নি।
এত নির্যাতন– সুদিন আসবেই!

৭.

মধ্যাহ্ন

সেলের মধ্যে একটি নিরালা দুপুর কত না প্রিয়!
চার ঘণ্টা নিরলস ঘুম।
স্বপ্ন দেখলাম ড্রাগনে চেপে চলেছি স্বর্গে...
জেগে উঠে এক ঝাঁকুনিতে ফিরে আসি কয়েদখানায়।

৮.

অপরাহ্ন

দুটো বাজেঃ খোলা হাওয়ার জন্য সেলের দরজা উন্মুক্ত হবে এখন।
এক পলক আকাশ দেখার জন্য সকলের মাথা উঁচু।
মুক্ত আত্মাগুলি স্বাধীনতার আকাশের দিকে ধাবিত,–
তুমি কি জান নিজের লোকেরা জেলে পচ্‌ছে?

৯.

সন্ধ্যা

খাওয়া শেষ হলে সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়
এবং চারদিক থেকে হঠাৎ লোকসংগীত ও ঐকতান
শুরু হলোঃ বিষণ্ন সিঙ্‌সি জেলখানা
যেন শিল্পমন্দিরে রূপান্তরিত।

১০.

জেলের খাবার

খাবার বলতে তো প্রতিবারই একদলা লাল চালের ভাত,
শব্‌জি নেই, নুন নেই, মেখে খাবার কিছুই নেইঃ
যারা খাবার দিয়ে যায় ওরা হয়তো কখন পেট ভরে খায়–
বাইরের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা ক্ষুধায় গোঙাচ্ছি।

১১.

সহবন্দীর বাঁশি

সহসা বাঁশির ডাকে জেগে ওঠে কৈশোরের স্মৃতিঃ
বিষণ্ন সংগীতের বিস্তার যেন ফোঁপান কান্নাঃ
নদী ও পর্বত পেরিয়ে সহস্র মাইল পথ
এ যাত্রা যেন বহমান দুঃখ, মনে হয় কোন রমণীকে দেখছি
বহু দূর স্তম্ভ থেকে হেঁটে আসছে কারো ঘরে ফেরার আশায়।

১২.

পদশৃংখল

১.

হাড়গিলার মতো ক্ষুধার্ত হা-মুখ নিয়ে
প্রত্যেক রাতে শিকলগুলি পা চিবিয়ে খায়
প্রত্যেক বন্দীর ডান পায়ে ওদের দাঁতের কামড় বসে গেছেঃ
নড়াচড়া কিম্বা সটান হবার জন্য কেবল বাঁ পা মুক্ত।

২.

তবু পৃথিবীতে এ বড় মজার ব্যাপার
শৃংখলিত হবার জন্য সকলে যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে
একবার বেড়ি পরলেই তো শান্তিতে ঘুমন যাবে
অন্যথায় মাথা গোঁজার মতো জায়গার অভাব।

১৩.

দাবাখেলা শেখা

১.

ক্লান্ত সময়কে দূরে ঠেলবার জন্য আমরা দাবা খেলা শিখছি।
সহস্র পদাতিক ও অশ্ব একে অপরের দিকে ধেয়ে আসছে,
আক্রমণাত্মক কার্যক্রম বা পশ্চাদ্‌পসরণে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়
প্রতিভা ও দ্রুত-পদক্ষেপ এগিয়ে যাবেই।

২.

দৃষ্টিকে প্রসারিত কর সুদূর দিগঞ্চলে
চিন্তার গভীরে মগ্নতা আসুক।
আক্রমণে সাহসী ও দুর্দমনীয় হও এবং
বিভ্রান্তিকর আদেশ জারি কর,–দ্বৈরথ হবে অর্থহীন।
যথার্থ সময় আসুক, একটি ছোট বাহিনীই তোমাকে জয় এনে দেবে

৩.

সৈন্যদল উভয়দিকে সমান শক্তিশালী
কিন্তু বিজয় তো একপক্ষের
নির্ভুল রণকৌশলে কখন আক্রমণ কখন পিছুহটা
এবং এই ভাবেই মহান সেনাপতিকে বিচার করা যায়।

১৪.

চন্দ্রালোক

বন্দীদের জন্য না আছে ফুল না মদিরা,
কিন্তু রাত্রি এত সুন্দর– এ রাত আমরা কিভাবে উদযাপন করি?
ঘুলঘুলির কাছে ছুটে গিয়ে আমি চাঁদের দিকে চেয়ে থাকি,
এবং ঐ গবাক্ষে উঁকি মেরে চাঁদ কবির দিকে চেয়ে হাসছে।

১৫.

জলের রেশন

প্রত্যেকের জন্য আধগামলা করে জল রেশনে বরাদ্দ
ধৌত কর্ম কিম্বা চা ফোটাবে– সে তোমার পছন্দঃ
যদি হাত মুখ ধুতে চাও তো চা খাওয়া হচ্ছে নাঃ
এবং চা খেতে চাও তো হাত মুখ অধৌত থেকে যাবে।

১৬.

মধ্যহেমন্তের উৎসব

১.

মধ্যহেমন্তের চাঁদ আয়নার মতো স্বচ্ছ গোলাকৃতি
এবং রুপালী জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী প্লাবিত
আত্মীয় পরিবেষ্টিত তোমরা যারা মধ্য-হেমন্তের উৎসবে মাতোয়ারা
জেলের বাসিন্দাদের মনে রেখ, ওরা দুঃখের তলানি
পান করে চলেছে।

২.

কয়েদখানায় আমরাও মধ্য-হেমন্তের উৎসব উদ্‌যাপন করি।
চাঁদও হেমন্তের বাতাস আমাদের জন্য বয়ে আনে বিষণ্নতার ঘ্রাণ।
হেমন্তের চাঁদ স্বাধীন উপভোগ বঞ্চিত হয়ে
হৃদয় আমার আকাশ লংঘনকারী ঐ চাঁদের পেছনে ধায়।

১৭.

জুয়া

জেলের বাইরে যারা জুয়া খেলে তাদের গ্রেফতার করা হলো।
কিন্তু একবার জেলে ঢুকতে পারলে মনের সুখে জুয়া খেলা যায়
তাই প্রায়শই শুনি বন্দীরা অভিযোগ করছে
'হায়রে পৃথিবীতে এমন মধুর জায়গায় আসার কথা
আগে কেন ভাবিনি!'

১৮.

জুয়ার জন্য জেল

জুয়ার জন্য যাদের জেল হলো সরকার তাদের খেতে দেয় না।
ফলে বিগত দিনের ত্রুটি থেকে তারা দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করেঃ
সম্পদশালী বন্দীরা প্রতিদিন পর্যাপ্ত আহার পায়
কিন্তু গরিবের দল শুধু চোখের জল ফেলে এবং
তাদের ক্ষুধার্ত মুখে লালা গড়ায়।

১৯.

'দ্বিদশম' দিবসে টিয়েন পাও অনএ বদলী

প্রতিটি ঘর ফুল এবং আলোকমালায় সেজেছে
জাতীয় দিবসে সমস্ত দেশ আনন্দে অধীর
কিন্তু ঐ দিনেই আমাকে শৃংখল পরান হলো এবং বদলীঃ
ঈগলের বিপরীতে বাতাস ধেয়ে চলেছে।

২০.

রাস্তায়

শুধু রাস্তায় নেমেই বিপদের বোঝা মাথায় নিতে পারি
একটি পর্বত অতিক্রম করার পর দ্বিতীয় পর্বতের অবস্থান
ধূসর দেখা যায়ঃ
কিন্তু প্রভূত কষ্ট স্বীকার করে যদি একবার চূড়ায় ওঠো
একবার তাকালেই সহস্র লি নজরে আসে।

২১.

রাত্রি নামে

অরণ্যক্লান্ত পাখিরা নীড়ের খোঁজে উড়ে বেড়ায়।
একটুকরো নির্জন মেঘ খোলা আকাশে ভেসে চলেছে।
দূরে ঐ পার্বত্য পল্লী; একটি বালিকা গম পিষ্‌ছে
গম পেষা শেষ হলো; উনুনে আগুন দাউ দাউ জ্বলছে।

২২

লুঙ জুয়েনে রাত্রিবাস

সারাদিন পা দুখানা ঘোড়ার মত ছুটছে ক্লান্তিহীন
রাতে হাতপা বেঁধে যেন মুরগি-মসল্লমের সংগে পরিবেশিত হই
এবং যুগপৎ ছারপোকার কামড় ও শীতের আক্রমণ ঘাড়ের উপর
অরিঅল পাখি ডাকছে, প্রভাতের ঘোষণা– আহা কী মধুর।

২৩.

টিয়েন পাও এ পৌঁছুলাম

আজ আমি তিপ্পান্ন কিলোমিটার পথ হেঁটে এলাম,
জামাকাপড় ঘামে ভেজা জুতো ছেঁড়াছিঁড়ি হয়ে ঝুলছে
এবং সারারাত জুড়ে একটু গা ফেলবার জায়গা নেই,
নোংরা একটা খানার পাশে আগামী দিনের অপেক্ষা করছি।

২৪.

জেলে সে তার স্বামীকে দেখতে এলো

স্বামী ভেতরে বন্দী
স্ত্রী গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে স্বামীকে দেখছে
ওরা এত কাছাকাছি, মাত্র কয়েক ইঞ্চির ফারাক
তবু কতনা দূর– যেন আকাশ ও সমুদ্রতল।
ভাষায় যা ওঠেনা ফুটে– ভীষণ চোখ তা বলে দেয় অবিকল
কথা বলার আগেই চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে
ওদের এই মিলন দেখে কার বুকে না রক্তপাত।

২৫.

খবরের কাগজে উইলকির অভ্যর্থনার ঘোষণা পড়ে

আমরা উভয়ে চীনের বন্ধু,
চলেছি চুঙ্ কিং এর পথে
কিন্তু তোমাকে দেওয়া হয়েছে সম্মানিত অতিথির আসন
অন্যদিকে আমি একজন বন্দী– পদতলে পিষ্ট–
আমরা এরূপ বিপরীত ভাবে ব্যবহৃত কেন?
একদিকে শীতার্ত ব্যবহার অন্যদিকে উষ্ণতার প্লাবন–
এই-ই বুঝি পৃথিবীর রীতি, কেননা স্মরণাতীত কাল থেকে
নদীতো সাগরে গিয়েই মেশে।

২৬.

জেলখানার পর পাহাড়ে হাঁটছি

পর্বতশীর্ষ ও মেঘের রাশি যেন একে অপরকে আলিংগন করছে
নীচে নদীররেখা আয়নার মতো উজ্জ্বল টলটলে নিষ্কলংক।
পশ্চিমাঞ্চলের পার্বত্যপথ পরিভ্রমণ করে হৃদয় আমার উথলে উঠে
দক্ষিণাবর্তের আকাশের দিকে চেয়ে আছি
স্বপ্নের মধ্যে পুরোনো বন্ধুরা হেঁটে আসে।

২৭.

সুন্দর আবহাওয়া

প্রকৃতির আবর্তে পরিবর্তিত হয় কাল
বর্ষার পর আসে উজ্জ্বল আকাশ
মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী তার ভিজে পোশাক ছেড়ে ফেলে
সহস্র লি দীর্ঘ পর্বতমালা কার্পেটের চাদর বিছিয়ে দেয়।
তপ্ত সূর্যালোক ও মুক্ত বাতাসে ফুলের গালে হাসির হিল্লোল
মহীরূহের পরিচ্ছন্ন শাখাংশে বিহগের সম্মিলিত গান।
রক্তের তাপে হৃদয় পূর্ণ– মানুষ জেগে উঠছে
বিগত দিনের তিক্ত দুর্দশা এখন সুখের রাস্তা গড়ে,
প্রকৃতির ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

২৮.

'সহস্র কবির সংকলন' পড়ে

প্রাচীন কবিতা ভালবাসে কেবল প্রকৃতির গান গাওয়াঃ
বরফ এবং ফুল, চাঁদ এবং বাতাস, পর্বত কুয়াশা ও নদী,
এখন আমাদের লোহা ও ইস্পাতের কবিতা লেখার সময়
এবং প্রতিটি কবির শিখে নিতে হবে আক্রমণে নেতৃত্ব দেওয়া।

২৯.

হেমন্তের রাত

গেটের সামনে রাইফেল ধারী রক্ষীরা
উপরে ছেঁড়া মেঘের দল চাঁদকে বয়ে নিয়ে যায়
বিছানায় ছারপোকাগুলো সেনাবাহিনীর ট্যাংকের মতো
ঘোরাফেরা করছে
এবং মশার স্কোয়ার্ডন আক্রমণ চালাচ্ছে বোমারু বিমানের মতো।
হৃদয় আমার সহস্য লি অতিক্রম করে স্বদেশের দিকে ধায়।
হাজার সুতো-মাকুর মতো স্বপ্ন আমার বিষণ্ণতায় বোনা।
নির্দোষ আমি, বৎসর ব্যাপী হাজতবাস বহন করে চলেছি।
অশ্রু কালিতে রূপান্তরিত– ভাবনা কবিতায়।

৩০.

চারমাস পরে

"জেলে একদিন, বাইরে হাজার দিনের সমান..."
প্রবীণ যাঁরা কত সঠিকভাবে বলেছেন একথা!
চারমাসের হাজতবাসে কোন মানবতার স্পর্শ নেই

এবং বয়স দশবছর বেড়ে গেল।
হ্যাঁ– চারমাস খাবার খাইনি কখন
একটি রাতও ঘুমতে পারিনি নিশ্চিন্তে–
চারমাস পোশাক পালটাইনি
করিনি স্নান।
আমার একটি দাঁত গেছে, চুল সব শাদা,
ক্ষুধা-শয়তানের তাড়নায় কৃশ এবং কালো হয়ে গেছি।
সৌভাগ্যঃ দৃঢ় ও ধৈর্যশীল থেকেছি,–এক বিন্দু টলিনি কখন,
যদিবা শরীর ধসে গেছে– তেজ অক্ষত।

৩১.

জেলের জীবন

ভাত তরকারি এবং চা করবার জন্য
প্রত্যেকের একটি করে স্টোভ আছে আছে কিছু মাটির বাসন।
জায়গাটা সারাদিন ধোঁয়ায় ঢাকা থাকে।

৩২.

এগারই নভেম্বর

১.
পূর্বে এগারই নভেম্বর ফিরে এলে
ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি উৎসব উদযাপিত হতো
এখন চারচারটি মহাদেশে রক্তাক্ত যুদ্ধের দামামা,
এবং নাজিবাহিনীই প্রধান অপরাধী।

২.
চীনের প্রতিরোধ যুদ্ধ প্রায় দু'মাস ধরে চলেছেঃ
চীনের বীরত্বের কথা জানে সকলে,
জয় তো হাতের মুঠোয়, কিন্তু প্রতিআক্রমণ যুঝতে
চাই প্রবল সংঘশক্তি।

৩.
এসিয়া জুড়ে জাপ-বিরোধী পতাকা উড়ছে
কোথাও ছোট কোথাও বড়– অবশ্যই তারা সমান শক্তিশালী নয়
আমাদের নিশ্চয়ই বৃহৎ পতাকা অর্জন করতে হবে কিন্তু
ছোটকেও চাই আমাদের।

মাও সেতুঙ

শৃংগগুলি!
নীলাভ স্বর্গে সূচবিদ্ধ, অগ্রভাগ অস্বচ্ছ;
আকাশ ভেঙে পড়তে পারে
কিন্তু এই স্তম্ভগুলি নয়।

চাংসা[১]

মগ্ন হেমন্তে আমি নির্জনে দাঁড়িয়ে একা
যেখানে 'কমলালেবু দ্বীপের'[২] আলপনাকে বেষ্টন করে
সিয়াং[৩]-এর জলোচ্ছ্বাস উত্তরে প্লাবিত।
গাঢ় রঙাচ্ছাদিত নিবিড় বনভূমির মধ্যে
দেখলাম আমি সহস্র শৈলমালার রক্তিম উদ্ভাস;
এবং টলটলে সবুজ জলরাশির উপর দিয়ে
শতাধিক জাহাজ সম্মুখে ধাবমান।
ঈগলেরা দূর দিগন্তে শানিত উড়ে যায়
স্বচ্ছ গভীরতায় মাছেরা চঞ্চল ঘোরাফেরা করেঃ
তুষার ঝরা আকাশের নীচে প্রাণীজগৎ এইভাবে স্বাধীনতার জন্য
সংগ্রামের লিপ্ত।
অসীমের চেতনায় বিহ্বল
আমি প্রশ্ন করিঃ "এই আবহমান মহান পৃথিবী–
কোন মহাপুরুষ এর উত্থানপতন সাধিত করে?"

সাথীর হাতে হাত ধরেই আমরা চলতে অভ্যস্ত;
সেই উজ্জ্বল চান্দ্রমাস, অসাধারণ বছরগুলি
এখনো দারুণ প্রত্যক্ষ
শিক্ষাব্রতীর উদ্দীপনা সহ জীবনের পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে
আমরা তখন 'স্কুলের বন্ধুরা'[৪] অনেক বেশি তরুণ,

---

[১] হুনান প্রদেশের রাজধানী।

[২] চাংসার পশ্চিমে অবস্থিত একটি দ্বীপপুঞ্জ।
এর চীনা নাম হলো– চুসেচৌ এবং শুইলুচৌ।

[৩] রোমান্টিক পারিপার্শ্বিকতার জন্য বিখ্যাতঃ নদী।

[৪] কবি (মাও সে-তুঙ) হুনান প্রদেশের শাওশান-এ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং চাংসার First Provincial Normal School এ পড়াশোনা করেন– ১৯১৩-১৯১৮ সাল পর্যন্ত; তখন তিনি অনেক ছাত্র আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯১১ সালে চীনে প্রথম আধুনিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালের ১লা এপ্রিল মাও New People's Study Circle গঠনের প্রস্তাব রাখেন। এর উদ্দেশ্য হল সর্বতোভাবে দেশ ও জাতিকে সর্বোচ্চ আদর্শে দীক্ষিত করা এবং দেশ ও জাতিকে সেবা করা। ৪ঠা মের আন্দোলনে এর সভ্য সংখ্যা সাতের ঘরে পৌঁছয়।

দ্বিধাহীন সমালোচনায়[৫] মুখর
জাতীয় ঘটনাবলীর উপর উপদেশের বন্যা
লিপিবদ্ধ ধর্মীয় অনুশাসন ও তার অন্ধ নগ্নতা
ঐসব সমরপতিরা[৬] আমাদের চোখে গোময় ভিন্ন কিছু নয়।

তথাপি মনে রাখি
মধ্যসমুদ্রে অভিযান চালিয়ে কী ভাবে আমরা
তরংগকে প্রতিহত করছি
এবং উদ্বেল পালকে রাখছি সংগত?

সোনালী সারণ পাহাড়ে[৭] স্তম্ভ

অর্থহীন ও অসমি ন'টি ধারা[৮] মাটির গর্ভ বেয়ে চলেছে,
দৃঢ় এবং স্থির জ্যামিতিক ধাতব পথ[৯] উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত,
মাকড়শার জালের ন্যায় ধূসর অস্পষ্ট কুয়াশা ও বৃষ্টির মধ্যে
'কূর্ম ও সর্পপাহাড়'[১০] বিশাল কিয়াং নদীকে ফাঁদে আটকেছে।

---

[৫] ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউয়ান-শি-কাই শাসনকর্তা তাং-সিয়াং মিং এর সমর্থন পুষ্ট হয়ে নিজেকে সম্রাট রূপে ঘোষণা করে। মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন এই ঘোষণার বিরোধিতা করে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম ও হ্যাণ্ডবিল ও পোস্টারের মাধ্যমে তীব্র আন্দোলন চালায় এবং রাজ্যপাল তাং সিয়ং মিং এর আমলাতান্ত্রিক দমনপীড়নের বীভৎস তাণ্ডব ছাত্রদের উপরে নেমে আসে। ফলে ছাত্র আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং জনসমর্থন এই আন্দোলনের পেছনে এসে শক্তি জোগায় এবং ছাত্র আন্দোলন জয়লাভে সমর্থ হয়।

[৬] Worlords: বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা–যাদের নিজস্বসেনাবাহিনী ছিল। অভ্যুত্থানের সময় চু-তে সহ বহু সমরপতি বিপ্লবীদের দলে যোগদান করে।

[৭] সোনালী সারস পাহাড় ইয়ুহানের পশ্চিমে ইয়াংজির তীরে অবস্থিত। পুরাণে কথিত আছে চিরায়ু সু-আন মৃত্যুহীন সোনালী সারসে চেপে এখানে এসেছিল। মতান্তরে ফি-ওয়েন-উই সারসে চেপে এখানে এসে অমরতা লাভ করে। ঐ ঘটনাগুলিকে স্মরণীয় করবার জন্য একটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীকালে স্থানটি জনগণের কাছে খুব প্রিয় এবং প্রাজ্ঞ ও কবিদের কাছে তীর্থরূপে বিবেচিত হয়।

[৮] পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সিয়া-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইউ চীন দেশের প্লাবন রোধ করবার জন্যে জীবনের অর্ধেক সময় ব্যয় করেন এবং ন'টি শাখানদীর উপর বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

[৯] কেনটন-পিকিং রেলপথ।

[১০] ইয়াংজি নদীর উভয় তীরে মুখোমুখি দুটি পাহাড়। এখানে নদী দারুণ খরস্রোতা।

কবি ও প্রাজ্ঞদের কাছে তীর্থে পরিণত করে
"সোনালী সারস"[১] কোন দিকে যায়?
সফেন সমুদ্রে আমি পবিত্র মদ[২] ঢেলে দিয়েছি,
আমার বুকের মধ্যে উথাল পাথাল, বুকের মধ্যে ঝড়।
আমার হৃৎস্পন্দনে উত্তাল সমুদ্রের নৃত্য।

বসন্ত। ১৯২৭

চিংকাংশান[৩]

পাহাড়ের সানুদেশ আমাদের নিশান ও পতাকায় পূর্ণ প্রেক্ষণে উদ্ভাসিত,
এবং শীর্ষে শিঙা ও জয়ভেরীর প্রত্যুত্তরঃ
সহস্র চতুরংগে[৪] আমরা শত্রু সৈন্য পরিবেষ্টিত,
উদ্বেগহীন স্থির, আমরা ঠিক আছি।

শতাব্দীপূর্বে আমরা দুর্গপ্রকার[৫] দৃঢ় নির্মাণ করেছিলাম,
মানুষের সংঘশক্তি নির্মাণ করেছে অজেয় দুর্গঃ
হুয়াংইয়াচি[৬] সদরে ঐ শোন কামানের বজ্রনির্ঘোষ,
শত্রু সৈন্য অন্ধকারে অদৃশ্য পলাতক।

চিয়াং ও কোয়াংসি চক্রের যুদ্ধ[৭]

বৃষ্টিপাত ও বাতাসের[৮] হঠাৎ দিক পরিবর্তন,
রণপতিরা[৯] পুনরায় যুদ্ধ বাধাল
এ যেন অঘ্রাণের শস্যক্ষেত্রে বৃষ্টির দাপট
তথাপি ভারি মগজে আর এক ঋতু 'সোনালী ফসলের'[১০] স্বপ্ন।

---

[১] পুরাণ বর্ণিত পাখির নাম।

[২] কবি সুশির বিখ্যাত Memories at Red Cliff' থেকে কথাটি স্মরণ করেছেন মাও সে-তুঙ।

[৩] ১০০ লি দীর্ঘ এবং ৫০০ লি পরিধি বিস্তৃত পাহাড়। ১৯২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাও সে-তুঙ এখানে বিপ্লবীদের প্রথম Base বা ঘাঁটি অঞ্চল তৈরি করেন, এবং ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে চু-তে এদের সঙ্গে যোগ দেয়।

[৪] কুয়োমিন্টাং এর সৈন্য বাহিনী ১৯২৭-১৯২৮ সালে এই সব ঘাঁটি অঞ্চল (Base) আক্রমণ করে এবং ঘিরে রাখে।

[৫] কনফুসিয়াসের সময় জো চিউ-মিং এর 'Chronicles of the States' অবলম্বনে।

[৬] পাহাড়ী অঞ্চলের একটি জেলা– যাকে মাও উদ্দেশ্যমূলক ভাবে উন্মুক্ত রেখেছিলেন শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করবার জন্য।

[৭] কোয়াংসি চক্র হান্‌কাও থেকে শুরু করে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দলপতিদের পরিপুষ্ট সমর্থন লাভ করে চিয়াংকাইশেকের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়।

[৮] অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী।

[৯] ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে worlord বা রণপতিরা নতুন করে যুদ্ধ শুরু করে।

অন্যদিকে দীর্ঘপদক্ষেপে লুঙইয়েন[১১] ও শাংঘাং[১২] অতিক্রম করে
লাল ফৌজ টিং নদী পেরিয়ে এলো,
সোনার পুষ্পাধারের[১৩] ভগ্নাংশ জুড়তে
যৌথমালিকানায় অংশ গ্রহণ ও জমি চিহ্নিতকরণে
আমরা এখন সত্যই ব্যস্ত।

হেমন্ত। ১৯২৯

'দ্বিনবম'[১৪] উৎসব

মানুষ কত দ্রুত বড় হয়! আকাশ কিন্তু এমন নয় যে
বছর বছর তাদের একটি করে 'দ্বিনবম' উৎসব উপহার দেবে;
যুদ্ধক্ষেত্রে যখন হরিদ্রাভ ফুলগুলি আশ্চর্য স্নিগ্ধ ও সুন্দর
তাদের উপর পুনরায় 'দ্বিনবম' উৎসব বর্তায়।

বছরে একবারই হেমন্তে বাতাস হয় উতরোল,
বসন্তের ঠিক বিপরীত
দূর দিগন্তে আকাশ সমুদ্র এবং মধ্যবর্তী কুয়াশার মিলন
তথা বর্ণিত বসন্ত ঋতু থেকে ভালো।

অক্টোবর। ১৯২৯

---

[১০] কথিত আছে যে তাঙ্ বংশের রাজত্ব কালে হানটনের কোন পান্থশালায় লু-শেং এর সঙ্গে অমর লু-ওয়েংর দেখা হয় এবং তার কাছে লু-শেং নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ব্যক্ত করে। লু-ওয়েং রাত কাটাবার জন্য তাকে একটি বালিস ধার দেয় এবং লু-শেং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে যে তার সমস্ত উচ্চাশা, সম্মান, ক্ষমতা, অর্থ, সবই করায়ত্ত। সুন্দরী স্ত্রী, পুত্রকন্যা সকলে আনন্দমুখর এবং কয়েক কুড়ি নাতিনাতনী। তারপর বৃদ্ধ বয়সে তার মৃত্যু হোল। কিন্তু ঘুম ভাঙতে সে দেখল পান্থশালার মালিক তার জন্য যে চাল ফোটাচ্ছিল তা-ও তখন পর্যন্ত রান্না হয়নি।

[১১] মে মাসের শেষ থেকে শুরু করে ১৯শে জুন পর্যন্ত লাল ফৌজ তিন বার লুঙইয়েন দখল করে।

[১২] ২১শে সেপ্টেম্বর সকালে লাল ফৌজ শাংঘাং দখল করে।

[১৩] চীনের উর্বর ভূমিকে তুলনা করা হয়েছে একটি সোনার পুষ্পাধারের সঙ্গে। Warlord রা এই ভূমিকে টুকরো টুকরো করে এবং মাও তা জোড়া লাগাতে ব্যস্ত।

[১৪] চীনদেশের চুং ইয়াং উৎসব। নবম চান্দ্রমাসের নবমদিনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের নিয়ম হলঃ মহামারীর হাত থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের উপরে গিয়ে পূর্ব-পুরুষদের সমাধিস্থান দর্শন করা।

নববর্ষ[১]

নিংহুয়া, চিংলিউ, কিউহুয়া[২]–
কী ভীষণ সরুপথ, কী নিবিড় বনভূমি এবং পিচ্ছিল শৈবালদাম
আমরা আজ কোন পথে যাই?
সোজা উইশান[৩] পাহাড়ের সানুদেশ আমাদের লক্ষ্য।
বন্ধুর উৎরাই পথে
আমাদের রক্ত পতাকা উড়ছে মৃদু হাওয়ায় ছবির মত!

জানুয়ারী। ১৯৩০

কোয়াঙচাঙের পথে[৪]

তুষারে শুভ্র সারা পৃথিবী;
অবস্থার গুরুভারে আমরা বরফের উপর দিয়ে চলেছি
দৃষ্টিতে কোথাও নেই সবুজ পাইন,
লালঝাণ্ডা হাওয়ায় উড়িয়ে আমরা অতিক্রম করি গিরিপথ
আমাদের মাথার উপর খাড়া পাহাড়[৫]।

এই অভিযান কোন দিকে ধায়?
কান কিয়াং[৬] যেখানে তুষার বাতাসে সমাচ্ছন্ন।
এ নির্দেশ গতকাল হয়েছে জারিঃ
"হাজার শ্রমিক হাজার কিষাণ দখল নেবে চিয়ান[৭] ভূমি।"

ফেব্রুয়ারি। ১৯৩০

---

[১] তেং সে-হুই এবং চাঙ টিং-চেঙ এর তথ্য থেকে জানা যায়– ১৯৩০ সালের প্রারম্ভে Fourth Red Army Unit এর চারটি স্তম্ভ (Four columns) পশ্চিম ফিউকিয়েনের অভ্যুত্থানের সময় কিউটিয়েন দিকে যাত্রা শুরু করে। লিয়েনচেং চিংলিউ কোইহুয়া এবং নিংহুয়ার উত্তর মুখে অভিযান চালায়। তাছাড়া উইয়ুশান এবং পশ্চিমাঞ্চলেও তারা অভিযান চালায় এবং কিয়াংসিতে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে।

[২] ফিউকিয়েন অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের নাম।

[৩] ফিউকিয়েন অঞ্চলের পাহাড়। চায়ের জন্য বিখ্যাত।

[৪] এই কবিতাটি লেখা হয় ১৯৩০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রথম সাফল্যমণ্ডিত সময় চিয়ান সম্পূর্ণ বরফে আবৃত। ২৪শ তারিখের আগে বেলা ১০টার সময় লাল ফৌজ তেঙ ইউন-শান এর ব্রিগেডকে পরাজিত করে। ডিসেম্বর মাসে কিউটাইনে প্রসিদ্ধ বৈঠকের পর লাল ফৌজকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান হয়।

[৫] ইয়ুনশান পর্বত শ্রেণী; ১,০৫৬ মিটার উঁচু।

[৬] কিয়াংসি প্রদেশের প্রধান নদী।

[৭] কিয়াংসি প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থান।

টিংচে থেকে চাংসা[৮]।

জুনমাসে স্বর্গের সামরিক[৯] বাহিনী দুর্বিনীত ও অসাধুকে শাস্তি দান করে
একটি সীমাহীন ফাঁসবাধা[১০] রজ্জুতে সশস্ত্র হয়ে
তারা পুরাণ বর্ণিত 'রক'[১১] পাখি ও শাদা তিমিকে বাঁধতে চায়।
সেনাপতি হুয়াং কুংলিউর[১২] সাঁজোয়াবাহিনীর উপর আস্থাশীল
কান্ নদীর দক্ষিণাঞ্চল ইতিমধ্যে লালে-লাল।

কিয়াংসি প্রদেশ মাদুরে মুড়ে
অযুত শ্রমিক অযুত কিষাণ লাফিয়ে ওঠে মধ্যরাতে,
হুনান এবং হুপেই প্রদেশ সরাসরি হারিয়ে দিয়ে
'আন্তর্জাতিক' সংগীত উৎসাহ শক্তি সহ
আমরা আকাশ থেকে ঘূর্ণি হাওয়া, ঝাঁপিয়ে পড়ি।

জুলাই। ১৯৩০

প্রথম অবরোধের বিরুদ্ধে[১৩]।

তুষারধৌত আকাশের নীচে বনাঞ্চল জ্বলছে সম্পূর্ণ রক্তাক্ত,
স্বর্গয় সামরিক বাহিনীর ক্রোধ মেঘের ভেলায় উর্ধ্বে উড্ডীন;
কুয়াশাচ্ছন্ন লুংকাঙের[১৪] চতুর্দিকে শৈল শিখর অস্পষ্ট।
একসাথে সকলে ধ্বনিত হয়ে উঠলঃ
দূর সীমান্তে সেনাপতি চাঙহুই-সান বন্দী।

---

[৮] নান্চাঙের যুদ্ধের পরই কবিতাটি লেখা হয় ১৯৩০ সালের জুনমাসে।

[৯] এখানে লাল ফৌজকে সেই সব সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে যারা নাকি স্বর্গের ইচ্ছাকে রূপ দান করে।

[১০] গর্বিত চুঙ চুন (খৃষ্ট পূর্ব ১৩৯–১১২) সম্রাট হান ইয়ুটি-কে আবেদন করেছিলেন যে তাকে একটা দীর্ঘ রজ্জুর ফাঁস দেওয়া হোক যাতে এই ফাঁস দিয়ে সে রাজা ইয়ুকে বন্দী করে আনতে পারে।

[১১] চুয়াং জু (আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ২৭৫) উত্তর সমুদ্রে একটি বিরাট তিমির বর্ণনা করেছে। এই তিমিটি একটা দারুণ ঘূর্ণি হাওয়ার মধ্যে 'রক' পাখিতে পরিণত হয়।

[১২] একজন প্রতিভাবান কমাণ্ডার। কৃষক এবং খনি মজদুরদের নিয়ে তার সৈন্য বাহিনী গঠিত ছিল।

[১৩] কবিতাটি দুভাগে লেখা হয়ঃ– চিয়াংকাইশেক ১০০,০০০ সৈন্য নিয়ে যখন আক্রমণ চালায় এবং অবরোধ করে তার অল্পদিন পরেই প্রথম স্তবক লেখা হয়। অবশ্য এরকম অবস্থা বেশি দিন টেকেনি। লাল ফৌজ ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩০, পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং পাঁচদিনে অবরোধ মুক্ত করে।
পরবর্তী স্তবক লেখা হয় দ্বিতীয় অবরোধের পর। এই সময় চিয়াং ২০০,০০০ সৈন্য নিয়োগ করেছিল। এই যুদ্ধ ১৯৩১ সালের মে মাসের ১৬ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এবং লাল ফৌজ জয় লাভ করে।

[১৪] কিয়াংসির একটি জায়গা।

কিয়াংসি প্রদেশে দু'লক্ষ সেনার পুনঃ প্রবেশ
দমকা-হাওয়া ধুলোর ঝড়ে অর্ধ পৃথিবী শ্বাসরুদ্ধ।
পুচৌশান পাহাড়ের পাদদেশে
একাগ্র এবং স্থির কর্মেরত লাল সেনার উজ্জ্বল সমাবেশ।

বসন্ত। ১৯৩১

দ্বিতীয় অবরোধের বিরুদ্ধে[১]

'শাদা মেঘ পাহাড়ের'[২] শীর্ষে মেঘেরাও সাহায্যে ইচ্ছুক,
'শাদা মেঘ পাহাড়ের' সানুদেশে বিজয় উল্লাস ত্বরান্বিত,
এমনকি বৃদ্ধ বনাঞ্চল[৩] এবং নষ্ট শাখাংশও এই যুগে সৈনিক
একটি রাইফেলাকীর্ণ বনভূমি বিমান নিয়ে ধেয়ে আসা
'উড়ন্ত সেনাপতির'[৪] মত ভয় দেখায়।

জনহীন কান নদীর গর্ভবেয়ে ও ফিউকিয়েন[৫] পাহাড়ের কন্দরে
সাত শত মাইল পথ পনের দিনে হেঁটে গেছি,
এ যেন মাদুরে গোটান সহস্র জোয়ানকে ঝাড়ুমেরে উড়িয়ে দেওয়া
এখন কেউ বুঝি কাঁদে[৬],–
যার রণ কৌশল– 'পতি পদক্ষেপে দুর্গ প্রাচীর'–
হায়, কি মূল্য তার?

বসন্ত। ১৯৩১

---

[১] ১৯৩১ সালে চিয়াংকাইশেকের দ্বিতীয় অবরোধের পর এই কবিতাটি লেখা হয়। চিয়াং এই অবরোধে ২০০,০০০ সৈন্য মোতায়েন করেছিল।

[২] কিয়াংসি প্রদেশের হুইচাং অঞ্চলের ৮০ লি পূর্বে এই পাহাড়টি অবস্থিত।

[৩] সমস্ত প্রকৃতি যেন লাল ফৌজকে সাহায্য করার জন্যে উন্মুখ।

[৪] হান রাজবংশের বিখ্যাত সেনাপতি লি কুয়াং এর কথা বলা হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত তৎপরতাপূর্ণ অভিযান চালনার জন্য তাকে 'Flying general' বা উড়ন্ত সেনাপতি বলা হোত। এই সেনাপতি তুরস্কের উপজাতিদের পরাজিত করে মংঘোলিয়া অধিকার করে।

[৫] চিয়াংকাইশেকের সৈন্যবাহিনী মধ্য কিয়াংসির চিয়ান অঞ্চল থেকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং প্রতি পদক্ষেপে আক্রমণ অবরোধের রণনীতি রচনা করে ৮০০ লি দূরে ফিউকিয়েন সীমান্তে হাজির হয়। ১৯৩১ সালের ১৫ই মে লাল ফৌজ চীনের ৮০ লি দক্ষিণ-পূর্বে ফিউকিয়েন আক্রমণ করে এবং এই আক্রমণে দুই ডিভিসন ওয়াংচিন ইউ এবং কাং পিং-ফান-সৈন্য হত্যা করে। তৎক্ষণাৎ তারা পূর্বদিকে মুখ ঘোরায় ও ১৫ দিনের মধ্যে ফিউকিয়েন সীমান্তে পৌঁছয় এবং ৩০শ তারিখে ৭০০ লি ব্যাপী তিনটি যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং ২০,০০০ রাইফেল ছিনিয়ে নেয় ও দ্বিতীয় অবরোধ মুক্ত করে।

[৬] চিয়াংকাইশকের কথা বলা হয়েছে।

হুই চাং[৭]

পূর্বাঞ্চলে প্রভাত হতে শুরু করেছেঃ
একথা বোলো না, আমরা অতিশীঘ্র যাত্রা আরম্ভ করেছি
যাদের নাকি বৃদ্ধ হবার পূর্বেই সবুজ পাহাড়গুলি পদদলিত
করবার কথা।
এ দিকের দৃশ্যাবলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুন্দর।

প্রাচীর হুইচাঙের বর্হিদেশে উঁচু শৃংগগুলি
স্তরে স্তরে পূর্ব-সমুদ্রে নেমে গেছে।
আমাদের জঙ্গী সেনারা দক্ষিণ কোয়াং টুঙে অভিযান চালায়,
দেখল তারা– এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্ভার অধিক সবুজ এবং বর্ণাঢ্য[৮]

গ্রীষ্ম। ১৯৩৪

লৌশান পাশ[৯]

পুবের হাওয়া হয়েছে ভীষণ!
তুষার প্রভাতে বনহংসীরা চাঁদের জন্য কাঁদে,
তুষার প্রভাতে অশ্বক্ষুরের ধাতব শব্দ,
ক্লান্ত বিউগল ধীরে ফুঁপিয়ে ওঠে।

লোহার ন্যায় কঠিন সত্য এই গিরিপথ বড় দ্রুত অতিক্রম কোরো না
কেননা এখন দৃঢ়পায়ে পর্বতশৃংগ দলিত করে
আমরা অগ্রসর হচ্ছি।
পর্বতশীর্ষ থেকে দেখা যায়–
স্তরে স্তরে পাহাড়গুলি ঢেউ এর মত নাচ্ছে
এবং অস্তগামী সূর্য যেন একদলা রক্ত।

ফেব্রুয়ারি। ১৯৩৫

---

[৭] ১৯২৯ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির লাল ফৌজ মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে উত্তর কিয়াংসি base বা ঘাঁটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য হুইচাং অঞ্চলে অগ্রসর হয়।

[৮] বর্ণনাটি সম্রাট কোয়াং উইযূর আত্মজীবনী "Annals of the Later Han Dynasty" একটি পঙ্ক্তি অবলম্বনে।

[৯] এই গিরিপথটি কিউচৌ প্রদেশের উত্তর সুনি অঞ্চলে অবস্থিত। রণনীতির দিক থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ।

লং মার্চের সময় ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে লালফৌজ শুনাই অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং ন্যু কিয়াং অতিক্রম করে তারা গিরিপথটি দখল করে ও শুনাইএর বিখ্যাত সম্মেলনে যোগদানের জন্য ইয়াংজী থেকে পশ্চাতে হেঁটে আসার পর ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারা দ্বিতীয়বার গিরিপথ বিধ্বস্ত করে। কবিতাটি তখনই লেখা হয়।

ষোলটি চরিত্রের তিনটি গান[১]

১

শৃংগগুলি!
'জিন' পরিত্যক্ত না হয়ে চাবুক উঁচু দ্রুত পর্বতারোহণ,
আমি পেছনে তাকাতে ভয় পাই,
বহিরাকাশে মাত্র দু'ফুট দু'ইঞ্চি স্থান।

২.

শৃংগগুলি।
ঝড়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া সমুদ্রের ঢেউএ উত্তাল,
অথবা যুদ্ধের আগুনে দীর্ঘপায়ে লাফিয়ে চলা
দশ হাজার অশ্ব।

৩.

শৃংগগুলি!
নীলাভ স্বর্গে সূচবিদ্ধ, অগ্রভাগ অস্বচ্ছ;
আকাশ ভেঙে পড়তে পারে
কিন্তু এই স্তম্ভগুলি নয়।

লংমার্চ। ১৯৩৪-১৯৩৫

লং মার্চ[২]

দীর্ঘ বিস্তারী 'লং মার্চে' লালফৌজ ভীত নয় মোটে,–
যোজন ব্যাপী বন্ধুর পর্বতমালা এবং সহস্র খরস্রোতা নদী কত তুচ্ছ
'পাঁচ পাহাড়'[৩] যেন নরম পাঁচটি আঙুল তরংগের ন্যায় বিস্তৃত,
'উমেংশ্রেণিকে'[৪] উপর থেকে মনে হয় রাশিকৃত মাটির স্তূপ।

---

[১] এই গানগুলি ১৯৩৪-১৯৩৫ লালে লং মার্চ এর সময় লেখা হয়েছিল।

[২] এই কবিতাটি ১৯৩৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি মিন্‌শান্‌ দখলের জন্য সাফল্যমণ্ডিত যুদ্ধের পর লেখা হয়।

১৯৩৪ সালে ১৬ই অক্টোবর রেড আর্মি কিয়াংসির ঘাঁটি অঞ্চল থেকে যাত্রা শুরু করে এবং তারপর তারা একাদিক্রমে দশটি প্রদেশে যুদ্ধ চালায়। ২৫,০০০ লি (৮,০০০ মাইল) ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমার পর পরের বছর অক্টোবর মাসে রেড আর্মি তাদের গন্তব্যস্থল শেনসিতে পৌঁছয়, এবং এখানে লাল ফৌজ জাপবিরোধী ঘাঁটি স্থাপন করে। ১০০,০০০ মানুষের মধ্যে এই অভিযানের শেষে দশজনে একজন মাত্র বেঁচে ছিল।

[৩] এই পাহাড়গুলি চীনের উত্তর পূর্বাঞ্চলে হাতের পাঁচটি আঙুলের মত ছড়িয়ে ছিল।

[৪] এই উচ্চ পর্বত শ্রেণি কিয়াইচাও এবং ইউন্‌নান্‌ প্রদেশের সীমান্তকে নীচে ধরে রেখেছে।

'সানার বালুকা'[৫] নদীর ঢেউ খাড়া পাহাড়ে উত্তপ্ত আঘাত হানুক,
এবং 'তাতু সেতু'[৬] লম্বমান শীতল লৌহ শৃংখল নিয়ে এদের মুখোমুখি
'মিন্‌শান্ পাহাড়ের'[৭] সহস্র লি বরফে ঢাকা আনন্দ মুখর
এবং সেনাবাহিনী একসংগে হেসে উঠল।

অক্টোবর। ১৯৩৫

তুষার

উত্তরাঞ্চলের দৃশ্যাবলীঃ
চতুর্দিকে বরফ ঝরে
যোজন ব্যাপী জমাট বাঁধা তুষার।
মহান প্রাচীরের ভেতর বাইরে দেখ
অনুর্বর, পতিত জমি শুধু—
বিশাল হো[৮] নদীর ঊর্ধ্ব এবং অধে
ফেনরাজি স্তব্ধ।
পাহাড় রুপোর সাপের মত নাচে
পর্বতমালা যেন মোম নির্মিত হস্তী, দুর্ধর্ষ
দেহ দিয়েই বুঝি দেবতার সাথে যোঝে।
একটি সুন্দর দিনের জন্য অপেক্ষা কর
যখন ভাস্বর শুভ্রতার উপর সূর্য সোনার রঙ ছড়ায়
এবং সমস্ত পরিবেশ উজ্জ্বল আনন্দময় হয়ে ওঠে।

এ দেশ কত রূপের উদ্ভাসে
নতজানু শতবীর তুলে নেয় জননীর করুণ বিভাস।

---

[৫] চীনদেশীয় নাম হোল চিন্ শা। ইউননানের নদী ইয়াংজী— তার উর্ধ্বাঞ্চল, এই অঞ্চলে নদী খুব দ্রুত বেগে প্রবাহিত হয়।

[৬] ইয়াজীর শাখা নদীর নাম তাতু। সেই নদীর উপরে সেতু। ১৩টি লৌহ শৃংখলের উপর আলগা পাটাতন দিয়ে তৈরী। ২০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সেতুটি দারুন খরস্রোতা এবং বরফগলা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ভীষণ ঠাণ্ডা। শত্রু সৈন্য দুর্ধর্ষ আক্রমণ চালিয়ে সেতুর অধিকাংশ দখল করে এবং সেতুটিকে বন্দুক দিয়ে ঘিরে রাখে। লং মার্চের সময় মাত্র চব্বিশটি স্বেচ্ছাসেবক প্রথম শত্রুর মুখোমুখি হয় এবং একে একে সেতুর শৃংখলগুলি অধিকার করে।

[৭] সীমান্ত অঞ্চলের বরফাচ্ছাদিত পর্বতমালা। এই পর্বতটি ছিল লং মার্চের শেষ বৃহত্তম শাখা। ১৪ই সেপ্টেম্বর কিয়াইচাও (Kweichow) অঞ্চলের মিয়াও (Miao) উপজাতি বাহিনীদ্বারা এই সর্বোচ্চ শৃংগ আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়।

[৮] হোয়াং হো

মহারাজ চিন্-হুয়াং[১] ও সম্রাট হান-উ[২]
তোমরা উভয়ে নীতিহীন– তোমাদের করুণা করি,
তাং সুং[৩] এবং সুং সুরাজ[৪] তোমরা কারুশিল্পে ধীর
এবং সেই ভ্রষ্টস্বর্গ[৫] শিশু
চেংগিজ্ খাঁ[৬],
জানত কেবল ধনুক বাণে ঈগল শিকার।
এ সবই অতীতের কথা।
মহান ব্যক্তি চিহ্নিতকরণে আর কেউ নয়
আজকের রক্তাক্ত সন্ধ্যা পথ দেখাবে।

ফেব্রুয়ারি। ১৯৩৬

মি. লিউ ইয়া-সে কে উত্তর[৭]।

[১৯৫০ সালে জাতীয় নাট্যোৎসবের আসরে অনুপ্রাণিত মি. লিউ ইয়া সে বিনা প্রস্তুতিতে 'ওয়ান শিশা' বা 'ওয়ান নদীর বালু' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। আমি সেই কবিতার আঙ্গিকে এই কবিতাটি লিখবার চেষ্টা করেছি– মাও সে-তুং]

ধর্মীয় কারণে রাত্রিযাপন অর্থহীন– কেননা
চীনের আকাশে এখন রক্তাক্ত সোনালী প্রভাত।
শতাব্দীব্যাপী শয়তানের ঘূর্ণি নৃত্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত
সত্তর কোটি মানুষ এযাবৎ কোন ঐক্য খুঁজে পায়নি;
তবু কখনো একটি মোরগ ডেকে ওঠে–
প্রভাত হয়েছে খবর জানায়;
চতুর্দিক এমনকি ইয়ুটিয়েন[৮] থেকেও সংগীত ভেসে আসছে,
আমাদের কবিরা এমন সমাদর পায়নি কখনো আগে।

অক্টোবর। ১৯৫০

---

[১] 'চীন্' (Chine) এর প্রথম সম্রাট (২৪৬–২১০ খৃষ্টপূর্ব)
[২] পশ্চিমাঞ্চলের হান বংশের রাজা (১৪০–৮৭ খৃষ্টপূর্ব)
[৩] তাং এর সম্রাট (খৃঃ ৬২৭–৬৪৯)
[৪] সাং এর প্রথম সম্রাট (খৃঃ ৯৬০–৯৭৬)
[৫] হানদের দেওয়া নাম। উত্তরাঞ্চলের আক্রমণকারীদের স্বর্গচ্যুত বলা হোত
[৬] ইতিহাস বিখ্যাত মংগোল নৃপতি। (খৃঃ ১২০৬-১২২৭)
[৭] ৩রা অক্টোবর জাতীয় নাট্য উৎসবে Cultural Work Corps of the South Eastern Nationalities সংস্থা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। মাও সে-তুঙ এবং কবি লিউ সেখানে উপস্থিত ছিলেন; মাও লিউকে একটি কবিতা লিখতে অনুরোধ করেন।
[৮] হানদের রাজত্বকালে পশ্চিমাঞ্চলের একটি জায়গার নাম।

পেইটাইহো।[৯]

ইউয়েনে[১০] মহান বৃষ্টি পড়ে
সফেন সাগর আকাশে ওড়ে
মাছের নৌকা হয়েছে উধাও
যায় না দেখা দ্বীপ চিনওয়াংটাও
এদের মূল্যে জান কি তারা আজকে কোথায়?
চল ফিরে যাই হাজার বছর
রাজা উইয়ু[১১] হেথা চাবুক চালায়
একটি কবিতা দিয়েছে কেবল
"চেইসি[১২] পাহাড়ে পূর্ববহর।"
'হেমন্তের হাওয়া'[১৩] রয়েছে এখন
গৃহহীন সে যে একা নির্জন
থাকেনা এমন থাকেনা এমন ইতিহাস পাল্টা!

গ্রীষ্ম। ১৯৫৪

সাঁতার'[১৪]

চাংসা নদীর জল পান করে
আমি ইতিমধ্যে উইয়ুচাং নদীর মাছ খেলাম।
দশহাজার লি দীর্ঘ ইয়াংজী নদী সাঁতরে
দূর চু[১৫] আকাশে আমার ব্যাপ্ত চেতনা গভীর অনুভব করি।
উদাসীন হাওয়া হয়েছে ভীষণ এবং উত্তাল সমুদ্রের ঝাপ্‌টা
নিকান উঠানে পায়চারি অথবা অবসর যাপনের চেয়ে
অনেক বেশি কাম্য।
আজ আমি সত্যই মুক্তি লাভ করলাম।

---

[৯] লোহিত সমুদ্রে একটি গ্রীষ্মাবাস।
[১০] হোপেই প্রদেশের পুরান নাম
[১১] "তিন রাজত্বের সময়ে" (খৃঃ ২২০–২৮০) ইয়ূ রাজ্যের স্রষ্টা, অন্য নাম সাও সাও।
[১২] সাও সাও এর লেখা কবিতার ভাবানুসারে।
[১৩] সাও সাও এর লেখা কবিতার ভাবানুসারে।
[১৪] ১৯৫৬ সালে মে মাসে মাও সে-তুঙ ইয়াংজী নদী উইয়ংচাঙ থেকে সাঁতরে পার হন। জুনের প্রারম্ভে মাও দ্বিতীয় বার নদী পারাপার করেন, তিনি তৃতীয় বার সাঁতার কাটেন হানুইয়াঙ থেকে উইয়ূচাং পর্যন্ত।
[১৫] চু রাজ্য

নদীর পারে প্রভু কনফুসিয়াস বলেছিলেনঃ
"এই ভাবে সবকিছু ভেসে চলে যায়।"

একটা হাওয়া বন্দরের ভাসমান জেটিকে দোল দিচ্ছে
"কূর্ম পাহাড়" স্থির "সর্প পাহাড়" স্তব্ধ;
অন্যদিকে মহৎ ভাবনাগুলির দ্রুত বৃদ্ধি।
একটা সেতু ঝুলছে উত্তর দক্ষিণে–
প্রকৃতির দুর্গে সাধারণের রাস্তা।
পশ্চিম নাগাল পেতে এখনো বাঁধ নির্মাণ বাকি,
উইশুয়ানের[১] অলৌকিক কুয়াশা ও বৃষ্টিপাত চূর্ণ করে
লম্বমান গিরি সংকটের মধ্যে একটি শান্ত হ্রদের উদয়।
দেবদেবী কি এখনো এখনো বেঁচে থাকবে
নাকি তারা এই পরিবর্তিত পৃথিবীতে অলৌকিক!

জুন। ১৯৫৬

---

[১] উইয়ুসান অঞ্চলের পাহাড়। এখানে ঈশ্বরের নামে একটি শৃংগ রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। Karl Marx– Mehring Franz, ২। Reminiscences of Marx @ Engles. ৩। Early Writings– Karl Marx, ৪। Karl Marx his life and works– John Spargo. ৫। K. Marx: his life @ environment-Sir Isaiah. ৬। The life and teaching of Karl Marx– John Lewis. ৭। Karl Marx, his life @ works– Ruehle Otto. ৮। Karl Marx dictionary– Karl Marx, ৯। Karl Marx: In his early writing– H.P. Adam. ১০। Marx Engles and the poets– Petter Demetz. ১১। এক্ষণ কার্ল মার্কস সংখ্যা। ১২। The young Stalin– Smith, Edward Ellis. ১৩। Stalin and his work: An assessment by Soviet ency clopedia. ১৪। Stalin's Works: An annotated bibligraphy. ১৫। Stalin: a political biographyDeutscher, Issac. ১৬। Joshep Stalin: a short biography– Moscow, Institute, ১৭। Stalin– Murphy J.Thomas. ১৮। I was Stalin's body Guard-Achmed. ১৯। The Private Life of J.Stalin– F.J. Hutton @ J. Bernard. ২০। The Rise and Fall of Strlin– Robert Payne. ২১। স্তালিন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ২২। The Red Ster Over China– E. Snow, ২৩। Mao-Tse-tung– Stuart Scharm, ২৪ ।Red China Today - Edger Snow. ২৫ । The other side of the River– Edger Snow. ২৬। The Poems of Mao-Tse-Tung– Mao-Tse-Tung. ২৭। On art and Literature_mao-Tse-Tung. ২৮। Problems of art and Literature– Mao-Tse-tung. ২৯। Selected works of Mao-Tse-tung. ৩০। Mao and the Chinese revolution-Mao-Tse-tung. ৩১। Prison Diary– Ho-Chi-Minh, ৩২। হো-চি-মিন ও ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ– অনুনয় চট্টোপাধ্যায় ৩৩। Lenin Selected works-vol 1, 2, 3, ৩৪। লেনিন শতাব্দী–দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৩৫ ।ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন– প্রগতি প্রকাশন, মস্কো। ৩৬। উত্তর যুগ– লেনিন সংখ্যা। ৩৭। সংবর্ত– লেনিন সংখ্যা। ৩৮। Vietanam Inside Story of the Guerilla war- Wilfred G. Burchett, ৩৯। On Literature and Art- A. Luna-charsky. ৪০। Socialist realism in Literature and Art-Progress Publishers. Moscow. ৪১। On Art and Literature– Lenin. ৪২। নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে– মাও সে-তুঙ। ৪৩। Karl Marx-A Biography. by the institute of Maxism Leninism Berlin 1968. নন্দন: এঙ্গেলস সংখ্যা।